কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর অথবা শাসানোর কাগজ

গচ্চা : ১০ টাকা

১৩ বছর
১ সংখ্যা

পত্রপাঠ

আগস্ট ২০১২

WHOযুগান্তর

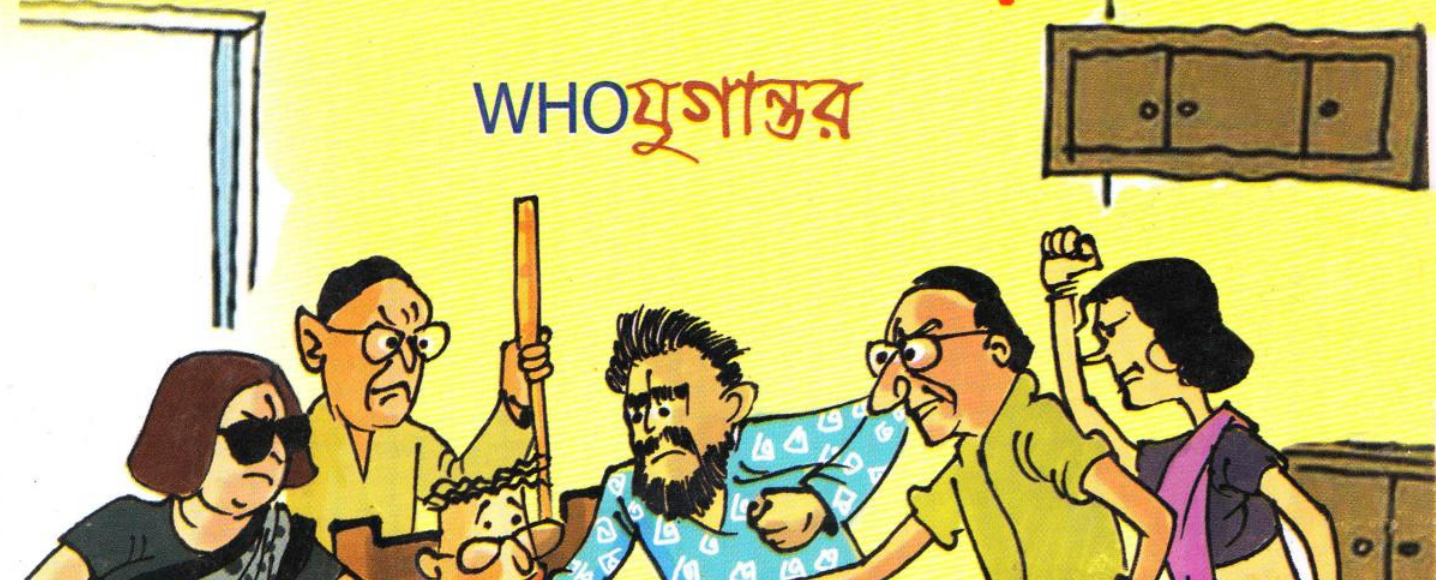

PROধান সম্পাদক : সমরেশ মজুমদার

Bশেষ উপদেষ্টা : জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - জয়ন্ত কর্মকার
স্ক্যান করেছেন - শুভায়ন দত্ত
এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

ভালোবাসার মূর্তবিগ্রহ দাদাভাই-এর জীবনীগ্রন্থ—
দাদাভাই—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

দাদাভাই বলেন, ভগবানকে ভালোবাসাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ।
দাদাভাই-এর কথা পড়ুন, প্রথম থেকে দ্বাদশ খণ্ড, ছয়খানি গ্রন্থে

পাতায় পাতায় ছবি ও শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা নিয়ে
সুদৃশ্য পার্চমেন্ট পেপারে মুদ্রিত
জন্মশতবার্ষিকী সংকলন
দাম : ৩০০ টাকা

দাদাভাই-এর কবিতা পড়ুন

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র ভূমিকা সম্বলিত চারটি কাব্যগ্রন্থের অখণ্ড সংকলন
পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাব্য চতুষ্টয়
দাম : ৩০০ টাকা

পরিবেশক: করুণা প্রকাশনী

এইচ. এম. ভি থেকে প্রকাশিত স্বকণ্ঠে দাদাভাই-এর কবিতা পাঠ শুনুন। ভাবনা ও গাথানি থেকে প্রকাশিত দাদাভাই-এর গান শুনুন হেমন্ত মুখার্জী, হৈমন্তী শুক্লা, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, শ্রীকান্ত আচার্য, শম্পা কুণ্ডু, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্তিশুভ্রা দে, বিনোদ দে, শিখা দে, শুভঙ্কর ভাস্কর, তপন রায়, মাদল, অভিজিৎ বসু, প্রমুখ শিল্পীর কণ্ঠে।

যোগাযোগ: **পীযূষালোক** ৯৮৩০০-৬৯৬৩২

'কন্টক যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহা বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাখে।'

বিশালাকৃতিক ডাইনোসর টিকতে পারেনি।
পারে না। কিন্তু পিঁপড়ে বেঁচে আছে।

পত্রপাঠ
আপনার নিজস্ব উঠোন

আপনি যদি প্রতিবাদী হন তাহলে চলে আসুন,
আপনার জন্য জায়গা রাখা আছে।
আসুন হাতে হাতে রেখে এগিয়ে চলি,
হাতে হাত ধরে বাঁচি।

বিশালাকৃতিক ডাইনোসর টিকতে পারেনি।
পারে না। কিন্তু পিঁপড়ে বেঁচে আছে।

আঞ্চলিক অধিকর্তা

আসাম, তেজপুর : ***নিরোদ চৌধুরী***—
৯৪৩৫৩-৮১০০৭
মুম্বাই, মালাড পশ্চিম : ***সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী***—
সম্পাদক, আনন্দ সংবাদ—৯৩২১১-৪৭৭৯৭

মুম্বাই, থানে—মীরা রোড : স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
(মুম্বাই ও থানের প্রধান পরিবেশক)
৯৮১৯৬-৬৭৪৪৩

জলপাইগুড়ি সদর : ***উমেশ শর্মা***—
৯৮৩২৪-৮৬৬৪৭
কোচবিহার, দিনহাটা : ***রাজা নাগ***—
৯৯৩২৬-৩৭২৫২
কোচবিহার সদর : ***অসিত সরকার***—
৯৪৭৪৪-২৫৫৮৮
হুগলী, ত্রিবেণী : ***রঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়***—
৯৯০৩৪-৩৯৬৫৯
মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ : ***সুজিতকুমার পাত্র***—
৯৭৩২৫-৮৯৬৩৮
মালদা : ***সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়***—
৯৪৩৪০-৬১২১৮
দুর্গাপুর : ***নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়***—
৯৬০৯৫-২৯৭৮০
দঃ দিনাজপুর, গঙ্গারামপুর : ***কৌশিক রায়***—
৮৯০০২-২২৯৭১

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো
বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

WHOযুগান্তর

গচ্চা ১০ টাকা

আগস্ট ২০১২

পত্রপাঠ

১৩ বর্ষ
১ সংখ্যা

PROধান সম্পাদক **সমরেশ মজুমদার** Bশেষ উপদ্বেষটা **জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র**

সম্পাদোদক : **শেখর আহমেদ**

অসহযোগী সম্পাদক : **প্রদ্যোৎকুমার মিত্র**

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর অথবা শাসানোর কাগজ

কুকার্য নির্বাহ

অঞ্জনা দত্ত ☽ শ্রীমতী লতিকা রায় ☽ বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ☽ বিপাশা সেন ☽ শচীন মিত্র ☽ ডঃ শুভাশিস নিয়োগী ☽ পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী ☽ প্রতাপকুমার দত্ত ☽ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ☽ ডাঃ বারীণ রায় ☽ ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ☽ অনুপম বড়াল ☽ প্রদ্যোৎকুমার সেন ☽ সুরজিৎ ভৌমিক ☽ শুভ্রেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ☽ সুবোধচন্দ্র পাল

সম্পাদোদকীয় ◻ ৭ পত্রপাঠ জবাব ◻ ৮

পুরনো কাসুন্দি

শিবরাম চক্রবর্তীর ''আমার ব্যাঘ্রপ্রাপ্তি'' ◻ ২৫

নিয়মিত কলম

সাম্যাজিক নোটবুক প্রদীপ কবির কড়চা ☺ জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র ◻ ১০ কইতে কথা আর বাধছে না ☺ সমরেশ মজুমদার ◻ ১৪ কূপমণ্ডুকের কলকাতা ডুয়েল ☺ ◻ ৩৫

কচিগল্প

প্রথম রাতেই ☺ রসপাষণ্ড ◻ ১৯
ভাবলেই ভ্যাবাচ্যাকা ☺ সন্দীপ রুদ্র ◻ ৩৪
তালাক ☺ অরবিন্দ ভট্টাচার্য ◻ ৩৮

গল্প

আই অ্যাম এ ডক্টর ☺ প্রণব হোড় ◻ ২০
ফেবু ☺ সুবীর ঘোষ ◻ ৩০

আনন্দের সঙ্গে বিষাদও বুঝি হাত ধরাধরি করে আসে। পত্রপাঠ এক যুগ পেরিয়ে তেরো বছরে পা দেওয়ায় তাঁর স্নেহের শেখর আহমেদের জন্যে গর্বিত, আবার প্রিয় বন্ধু বাংলাদেশের কালজয়ী সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের অকাল প্রয়াণে মর্মাহত—

সমরেশ মজুমদার ১৪

জাদু কাঠিতে নিব লাগিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বেশ বড়সড় একখানা কবিতা। নিছকই কবিতা বেরোলো নিব দিয়ে? না তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ নিবের খোঁচাও আহত করল কাউকে কাউকে?—

জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র ১০

রসকাব্য

অনৈক তান ☺ রসপাষণ্ড ◘ ১৬

শেষ পাত ☺ আমু ◘ ১২, ২৪, ৩৫, ৪৩, ৪৯

বোতামাভাব ☺ দিগম্বর দাশগুপ্ত ◘ ২৮

বাসন কই? ☺ আনন্দম্ শাস্ত্রী ◘ ২৮

ছিমেরিক ☺ রসপাষণ্ড ◘ ২৯

রেখায় লেখায় যুগলবন্দী ☺ প্রণব হোড় ◘ ৫০

ভিন্‌রাজ্যের রসকাব্য

এক ঔরতকে তালাকসুদা ভূতপূর্ব্ পতি আউর বর্ত্মান পতিকে বিচ্ সম্বন্ধ্ ☺ প্রসন্ন্ খড়্গপুরী ◘ ৪৭

আড্ডাকথন

পত্রপাঠ আড্ডার কয়েকজন ☺ আমিত গঙ্গোপাধ্যায় ◘ ৩৯

তুলোধোনা

হীরকরাণীর দেশে ☺ পীযূষকান্তি সেন ◘ ৩৭

বিরস রচনা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ☺ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ◘ ৪১

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ☺ রঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ◘ ৪২

রসচর্চা

করলা মিত্র ◘ ১৭ সুবোধচন্দ্র পাল ◘ ৩২ এস এম এস সমাচার (প্রধান সংগ্রাহক সৌমেন মিত্র) ◘ ১৭, ১৯

নিয়মিত বিভাগ

জবর খবর ◘ ২৮, ৩২ অনর্থ ◘ ৩২ শুনছি নাকি ◘ ৯ ট্যারা চোখে ◘ ৩৭ সবজান্তা বনাম হাল্‌ফজান্তা ◘ ৯ বকু বাঙালের বকলমে—সম্পর্ক ◘ ১২ সেরা কার্টুন ◘ ১১ Class-E-Fried বিজ্ঞাপন ◘ ১৩ হেঁসেল ◘ ১৫ আছোলা বাঁশ ◘ ২৪ শচীনকত্তা কী কইলেন ◘ ১৮ ধারাবাহিক কবিতা, পোস্ট পোস্ট মডার্ন কবিতা ◘ ২৪ ক্ষ্যামা করিনি ◘ ৪৯ লোপামুদ্রার ই-মেল ◘ ৪৩ সাহিত্য দুঃসংবাদ ◘ ৪৬

কার্টুন

প্রণব হোড় ◘ ১২ বিপ্লব ভট্টাচার্য ◘ ২৩, ৩১, ৪৬

কৃতজ্ঞতা দি নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ডেকান ক্রনিকাল

প্রচ্ছদ : সন্দীপ দেবনাথ

অঙ্কন

সন্দীপ দেবনাথ ☺ প্রণব হোড় ☺ চন্দন মিশ্র ☺ বিপ্লব ভট্টাচার্য

বেআইনি উপদেষ্টা : শুভ্রেন্দু হালদার ও শান হক *অ্যাডভোকেট*

কম্পিউটার বিভাগ পরিচালনা মানিকলাল বসাক

কর্ম সহযোগী কাজী মেহেরউল ইসলাম (বাবলু)

সংরক্ষণ তাপসী বিশ্বাস

পত্রপাঠ

প্রধান পরিবেশক

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টৌটী লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬

ফোন : ২২৫২-৭৮১৬

e-mail **vishal@cal.vsnl.net.in**

সহ পরিবেশক

পাতিরাম, কলেজস্ট্রীট চৌমাথা, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

এবং

হাওড়া ও ডেকার্স লেনের পত্রিকা পরিবেশকগণ

আপনার হকার কিংবা নিকটস্থ পত্র-পত্রিকা বিক্রেতাকে বলুন পত্রপাঠ এনে দিতে। না দিলে, গাদা গাদা তাগাদায় দায় নিতে বাধ্য করুন।

(+91) 99036-24992

ফাটাফাটির জন্য সম্পাদক হামেশা তৈয়ার হ্যায়—

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

e-mail **patrapath@gmail.com**

রেজিস্টার্ড অফিস ১০ জে ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

সম্পাদকীয় দপ্তর : ১০ বি ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০১৯, ফোন : ৯৯০৩৬-২৪৯৯২ (সম্পাদক), লেখা আঁকা বা টাকা পাঠান সম্পাদকীয় দপ্তরের ঠিকানায়।

আমাদের যাত্রা হল শুরু

পৃষ্ঠপোষক সংঘ অথবা পত্রপাঠ কারারক্ষী সমিতি

অরবিন্দ ভট্টাচার্য, *পাটুলি, কলকাতা-৯৪*
অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, *মাঙ্গালিক হাউজিং কমপ্লেক্স, কলকাতা-৯৪*
সুবোধচন্দ্র পাল, *বালীগঞ্জ ফাঁড়ি, কলকাতা-১৯*
সংঘমিত্রা কর, *শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১*
অজয় বিশ্বাস, *যোগেন্দ্র গার্ডেন, কলকাতা-৭৮*
অসিতকুমার গুহ, *টালিগঞ্জ, কলকাতা-৩৩*
কল্যাণকুমার চ্যাটার্জী, *শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১*
বি. বি. মুখার্জী, *অনিল মৈত্র রোড, কলকাতা-১৯*
অনন্যা মিশ্র, *গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৪৪*
অধ্যাপক কে. এল. চ্যাটার্জী, *ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স, কলকাতা-১৯*
শ্রীমতী পলি চৌধুরী, *গাঙ্গুলীবাগান, কলকাতা-৮৬*
অসিত গুহ, *ফার্ণ রোড, কলকাতা-১৯*
সৌমেন মিত্র, *পোদ্দার নগর, যাদবপুর, কলকাতা-৩২*
অধ্যাপক বিনতানন্দ দাশগুপ্ত, *বীরপাড়া লেন, কলকাতা-৩০*
সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, *মালাড (পশ্চিম), মুম্বাই*
অপর্ণা মুখোপাধ্যায়, *থানে, মুম্বাই*
নিরোদ চৌধুরী, *তেজপুর, আসাম*
রঞ্জিতকুমার ব্যানার্জী, *ত্রিবেণী, হুগলী*
রাজা নাগ, *দিনহাটা, কুচবিহার*
শ্রীমতী তাপসী বিশ্বাস, *রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা-১০৭*
অধ্যাপিকা বুলু মুখার্জী, *বেহালা, কলকাতা-৩৪*
সুজিতকুমার পাত্র, *আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ*
উমেশ শর্মা, *জলপাইগুড়ি*
বিষ্ণুজ্যোতি রায়, *কাপিষ্ঠা, বাঁকুড়া*
ডাঃ মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনীয়া, *বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর*
শ্রীমতী ঝর্ণা রায় চৌধুরী, *মঙ্গালম পার্ক, কলকাতা-৩৪*
সুমিতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রামকৃষ্ণ সরণি, কলকাতা-৬০*
পরিতোষ মাজি, *শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১*
সুতপা ধর, *বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা-৬*
অসিত সরকার, *নিউ টাউন, কুচবিহার*
অজিত বসু, *হলধর বর্ধন লেন, কলকাতা-১২*
ডঃ বীণাপাণি রায় চৌধুরী, *রাসেল স্ট্রীট, কলকাতা-৭১*
অরুণাভ পাঠক, *হাটমুড়া, পুরুলিয়া*
ভরসা অনুপ ভরসা, *তাজনগর, পূর্ব মেদিনীপুর*
তপনকুমার দাস, *খড়দা, কলকাতা-১১৯*
মানা দে, *সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯*
ডাঃ সরসিজ ঘোষ, *টেগোর পার্ক, কলকাতা-৩৯*
প্রণবকুমার চক্রবর্তী, *বারাসত, কলকাতা-১২৪*
শ্রীমতী মায়া সিদ্ধান্ত, *বন্দেল রোড, কলকাতা-১৯*
কৌশিক রায়, *গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর*

কারারক্ষী সমিতির সদস্য হওয়ার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করেছেন দুর্গাপুর থেকে **শ্রী (অথবা বিশ্রী) দেবপ্রসাদ কুমার**। ধন্যবাদ তাঁকে।

বারো বছরে নিজের পকেট সম্পূর্ণ সাফ হয়ে যাওয়ায় সম্পাদক পত্রপাঠ কারাগার বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে কেটে পড়ছিলেন। কিন্তু কারাগারের বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় দাঁড়ালেই আমরা কয়েদীরা পত্রপাঠ দম বন্ধ হয়ে পটল তুলব। তাই "পত্রপাঠ কারারক্ষী সমিতি" গঠন করে পত্রপাঠ কারগার চালু রেখেছি। এই অনবদ্য পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রাখতে আপনিও এগিয়ে আসুন। এই সমিতির সদস্য হলে আপনাকে আর আলাদা করে গ্রাহক চাঁদা দিতে হবে না। সম্পাদকের স্বৈরাচারী সর্বনাশা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁকে ফোন করে তুলোধোনা করুন, আজই।

৯৯০৩৬-২৪৯৯২

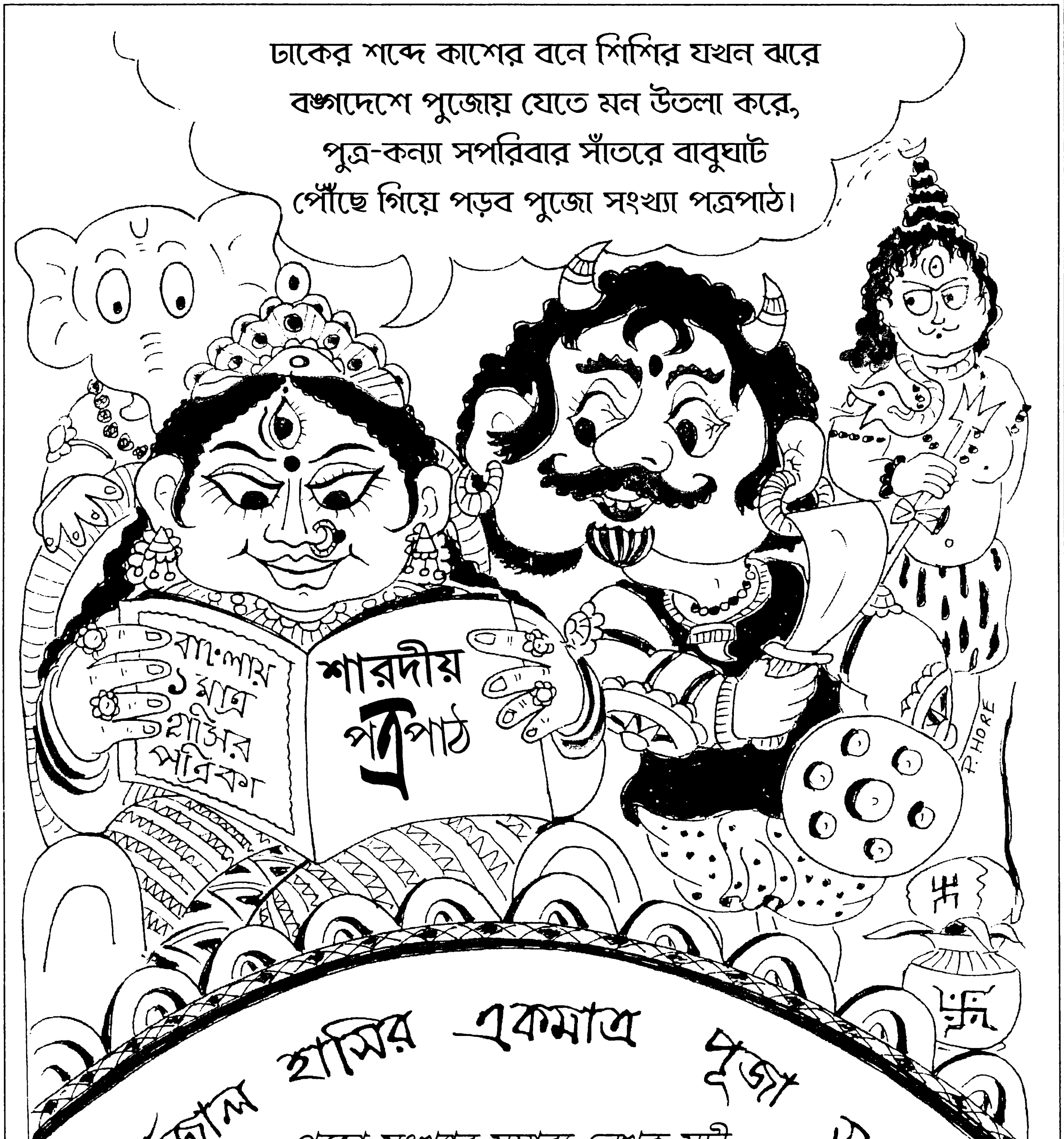

পুজো সংখ্যার সম্ভাব্য লেখক সূচী

গচ্ছা মাত্র ৪০ টাকা। হকার কিংবা বেকার যে কাউকে ধরে পাওয়া নিশ্চিত করুন। মাত্তর এক কপি ছাপা হবে।

শক্তিপদ রাজগুরু
অমিতাভ চৌধুরি
সমরেশ মজুমদার
নবনীতা দেব সেন
কণা বসু মিশ্র
পি সি সরকার *জুনিয়র*
সুবল চক্রাচার্য
স্বপ্নময় চক্রবর্তী
প্রচেত গুপ্ত

সুবোধ সরকার
দীপ মুখোপাধ্যায়
অপূর্ব দত্ত
রতনতনু ঘাটী
শ্যামলকান্তি দাশ
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
তপনকুমার দাস
রসপাষণ্ড
সুবোধচন্দ্র পাল

দেবপ্রসাদ কুমার
সৌমেন মিত্র
সংঘমিত্রা কর
পলি চৌধুরী এবং এবং....

বিশেষ আকর্ষণ—
নারায়ণ দেবনাথের চিত্রকাহিনী

সম্পাদোNকীয়

অঙ্কন সন্দীপ দেবনাথ

তেরোর গেরো

আমাদিগের মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের কোনো তুলনাই হয় না। বিশেষত পলায়ন পটুত্বে। সাহস তাঁহার চিরকালই অধিক। কিন্তু এবারে একেবারে দুঃসাহস দেখাইয়া বসিলেন। পত্রপাঠ কারাগারে লক আউট ঘোষণা করিয়া কাটিয়া পড়িতেছিলেন। বারো বৎসর পূর্বে যে হুযুগ তিনি তুলিয়াছিলেন, ফুচুক্ করিয়া তাহাতে কাঁচি চালাইয়া দিলেন! কিন্তু পলাইবেন কোথা? আমাদিগের চর সংখ্যা কি কম? অগুণতি। ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনি....। "ও বাবা ওই সম্পাদক পালাচ্ছে", "ও মা, সম্পাদক পত্রপাঠ বন্ধ করে পালাচ্ছে; আমরা কী পড়ে হাসব তবে?" ইত্যাদি মহা শোরগোল বাধাইয়া দিল। তাহাদিগের হাসির কাগজ, আমাদিগের ফাঁসির কাগজ। কখন যে কাহার মুখোশের আড়ালের মুখটি প্রকাশ করিয়া দিয়া ফাঁসাইবেন—এ বিষয়েও সম্পাদকের তুলনা হয় না। দৌড় বিদ্যায় তিনি যদি হন ভারত চ্যাম্পিয়ান তো আমরা এক-একটি অলিম্পিয়ান। ধরিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। বেগকে আবেগে চালান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি যে, অন্য কাহাকে সম্পাদক করিয়া তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হউক।....আমাদিগকে কি পাগলা কুত্তায় কাটিয়াছে যে তাঁহাকে কাটিবার সুযোগ দিব? প্রাণাতিপাত করিয়া অমন হাড়ভাঙা খাটুনি কে খাটিবে? অমন সোজা-সাপ্টা কথাই বা কে বলিবে? পদযুগল আমাদিগের যতই দ্রুতগামী হউক, ঘাড়ের উপর একটি মাত্র মস্তক। সম্পাদকের কয়টি জানা নাই। বহিরঙ্গে যদিচ একটিই প্রদর্শিত হয়, আমাদিগের স্থির বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য। নহিলে এতজন তাঁহার এত মুণ্ডপাত করা সত্ত্বেও কী করিয়া ঠিক একটি মুণ্ড ঘাড়ের উপর বিরাজ করে তাঁহার? যাহা হউক, পাকাড়ানো পূর্বক তাঁহাকে অবশ্য যথেষ্ট সমাদর সহকারে আমরা পত্রপাঠ দপ্তরে ফিরাইয়া আনিয়াছি। যাহাকে বলে একেবারে জামাই-আদর। উপরের চিত্রেই সে আদরের নমুনা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

বন্ধ করিবার হুযুগ বন্ধ করতঃ পত্রপাঠের যুগান্তর হইল। WHOযুগান্তর! কে বা কাহারা আনিল সেই যুগান্তর? সম্পাদক? ছোঃ! তবে? WHO? WHO? হুঁ হুঁ, ভাবিয়া দেখুন, ভাবিতেই থাকুন! উত্তর মিলিয়া গেলে লটারি করিয়া পত্রপাঠের WHOযুগান্তর সংখ্যা এক কপি পুরস্কার দেওয়া হইবে। লাগিয়া পড়ুন কপাল ঠুকিয়া।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন

দ্বিতীয় সুগ্রীব

সং-গৎ-এ

অধুনা কৈকেয়ী

তরুণিমা সান্যাল, চাকদহ, নদীয়া

❋ ভগবান আর ডাক্তারের মধ্যে মিল কোথায়?

☐ ভগবানে ক্ষেপে গেলে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেয় আর ডাক্তার ক্ষেপে গেলে ভগবানের কাছে।

মনসিজ মজুমদার, কলকাতা-১০

❋ "টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রথম একশজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় নাম উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

☐ মমতা আগেই বলেছিলেন "টাইম"-এ কাজ শেষ করুন!

ভয়ভঞ্জন ভুঁইয়া, মেদিনীপুর টাউন

❋ দুর্নীতির বিরুদ্ধে একজোট হলেন আন্না হাজারে এবং বাবা রামদেব। আবারও একসঙ্গে আন্দোলনে সামিল দু'জনেই। দিল্লীর যন্তর মন্তরে অচিরেই যৌথ অনশনে বসতে চলেছেন তাঁরা।

☐ যন্তর আর মন্তর!

আনন্দ মুখার্জী, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা

❋ গত দশ বছরে সোনাগাছিতে কন্ডোম ব্যবহারের হার ২.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১ শতাংশ। উৎফুল্ল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO.

☐ বিশ্ব জুড়ে সোনাগাছির নাম ছড়াচ্ছে WHO WHO করে।

রঞ্জিতা নাথ, কসবা, কলকাতা-৪২

❋ I. P. L. যা উন্মাদনা তৈরি করেছে! এবার টেস্ট কিংবা ওয়ান ডে ক্রিকেটের কী অবস্থা হবে?

☐ B. P. L.-এ পরিণত হবে। অনেক কম দরে ব্যাট-বল-উইকেট এমনকি ফ্রী রেশনও পেয়ে যাবে।

পিটার পাল, কলকাতা-৩৯

❋ কলকাতাকে যে হারে নীল-সাদা করানো হচ্ছে, কলকাতার একমাত্র নদী হুগলী নদীর কী দশা হবে?

☐ কলকাতা লন্ডন হবে আর হুগলী নদী নীল-নদ হয়ে যাবে।

মামুন আল হক, বসিরহাট

❋ গত ১৯শে এপ্রিল ভারত প্রথম আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি'র সফল উৎক্ষেপণ করল। ৫ হাজার কিলোমিটার পাল্লার অগ্নি।

☐ অগ্নিতে ৫ ফোড়ন!

রউফ হালদার, আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা

❋ অ্যাগ্রেসিভ নারীরা পুরুষকে ক্রমাগত চাপে রাখতে রাখতে ভবিষ্যতে বৃহন্নলায় পরিণত করবে বলে আশঙ্কা।

☐ খুব ভালো। মহাভারত রিপিটেড হবে। আর টিভি সিরিয়ালে নয়, স্বচক্ষে আর একটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখতে পাবেন।

বাবুরাম সাপুড়ে, ভাঙ্গড়, দঃ ২৪ পরগণা

❋ কলকাতায় এত বাজার আছে। পাখির বাজার। মাছের বাজার। ফার্ণিচারের বাজার (চোরা বাজার)। সাপের কোনো বাজার নেই কেন?

☐ কেন থাকবে না? সাপুড়ে, যা তা সাপুড়ে নয়, একেবারে সুকুমার রায়ের ক্যারেক্টার, হয়ে সাপের খবরই রাখেন না? 'নাগের বাজার'টা তাহলে কী করতে আছে শুনি!!

শ্যামাচরণ গড়াই, বাঁকুড়া

❋ কলকাতায় কোথায় বিহারীদের Rush বেশি?

☐ রাসবিহারীতে!!

মমতাজউদ্দিন শেখ, মালদা

❋ বিনি পয়সায় গোলাপজাম খেতে চাই।

☐ পাশাপাশি গোলাপ গাছ আর জাম গাছ লাগিয়ে দিন আপনার বাগানে।

রতনকান্ত বসাক, কলকাতা-১৯

❋ "হেমলক সোসাইটি" সিনেমায় আত্মহত্যার কত সহজ উপায় বাতলেছে। তার চেয়ে সোজা রাস্তা দেখাতে পারেন?

☐ পত্রপাঠ-এর সম্পাদক হয়ে যান।

সবজান্তা বনাম হাল্‌ফজান্তা

সবজান্তা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পি এ সাংমা হেরে গেলেন কেন?

হাল্‌ফজান্তা সাংসদ আর বিধায়করা তাঁকে কম ভোট দিয়েছেন বলে।

সবজান্তা কেন কম ভোট দিল?

হাল্‌ফজান্তা বেশিরভাগ দলই প্রণব মুখার্জীকে সমর্থন করল যে।

সবজান্তা কেন করল?

হাল্‌ফজান্তা সে তাদের দলীয় ব্যাপার।

সবজান্তা উঁহু! সাংমা গোপনে বলেছিলেন তাঁকে যেন বেশি ভোট দেওয়া না হয়।

হাল্‌ফজান্তা কেন? কী লাভ তাতে তাঁর?

সবজান্তা উফ! এটাও বুঝিস না? প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতি হওয়াকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করার জন্যে। নিজে রাষ্ট্রপতি হলে কি আর সে সুযোগ পেতেন!

শুনছি নাকি....

ঘোড়ার কোনো তুলনা হয় না। ঘোড়া কখনো মানুষ হতে চায় কি না জানা নেই, তবে মানুষ যে ঘোড়া হতে চায় তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এই যেমন, সাংসদ হয়ে প্রথম জীবনে প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতির ঘোড়া হতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই রাষ্ট্রপতি হলেন। এভাবে কেউ কেউ চাইছেন টাটার ব্যক্তিগত প্লেন হতে; তারপর অবশ্যই তিনি নিজেই টাটা হয়ে যাবেন। কেউ চাইছেন মিত্তালের বাড়ির প্রিয় সোফা হতে। তারপর তিনি অবশ্যই মিত্তাল হয়ে যাবেন। কেউ কেউ (মহিলারা) চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে পায়ের নীল-সাদা হাওয়াই চপ্পল হতে। তারপর তিনি অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে যাবেন। কিন্তু কেউই বুদ্ধ অথবা কারাতের কিছু হতে চাইছেন না। তাতে নাকি বুদ্ধু হওয়ার এবং করাতকলে কাটা পড়ার বিপুল সম্ভাবনা।

থাকো সুখে হাস্যমুখে

আরব কিংবা আমেরিকা, দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুন, আপনাকে হাসিমুখে রাখতে—ঠিক এই আমার মতো—পত্রপাঠের জুড়ি নেই।

পত্রপাঠ

বার্ষিক জেলভাড়া

ভারতের মধ্যে যে চুলোয় হোক : বার্ষিক ১৫০

ভারতের বাইরে, যে কোনো চুলোয় : বার্ষিক ১৩০০

মানি অর্ডার ও ক্যুরিয়ার করতে হলে—

PATRAPATH
C/O.- ADHIR MUHURI
'HEAVENLY' Tailors
8/11, FERN ROAD,
KOLKATA-700 019

ফাটাফাটির জন্য
PHONE:
(+91) 99036-24992
96741-09130
(EDITOR)

আঃ জীবন কারাবাস
(মন্দ ব্যবহারের জন্য ৪ বছর রেহাই দিয়ে ১০ বছর পরেই খালাস)

ভূভারতে ১,৩০০ টাকা
অভারতে ১১,০০০ টাকা

সংঘমিত্রা কর

প্রদীপ কবির কড়চা

জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র-এর সাম্ম্যাজিক নোটবুক

এই তো ক'দিন আগে,
পোকায় খাওয়া অর্থবিহীন ঘুণাক্ষরের মতো,
বেরিয়েছিল কলম ঘষে লেখা কয়েক লাইন।
না ছিল তায় ছন্দ-টন্দ,
রূপ-রস-ভরা গন্ধ-টন্ধ,
অথবা কোনো আঁতলামি ভরা, নিয়ম-ভাঙা আইন।

এক রসিক প্রকাশক,
ক'দিন ধরেই লেগেছিলেন আমার পিছু পিছু,
খাতাটাকে নিয়ে কেড়ে
দুই চামচ তার গরম গরম
পাতেতে দিলেন বেড়ে।
ঠাট্টা করেই ছেপেছিলেন, খোব্‌লানো তার কিছু।
(তাতে) পাঠককুলে ব'য়ে গেছে।
(বাদবাকীদের বয়ে গেছে)
মৃদুভোল্টের শক্‌।
স্‌ফেস্টি-নস্টি-গসিপাসরে ওঁরা বলেছেন "বা-রে!
মাদারি দেখি লিখতে পারে.......যদিও প্রচুর ভুল
ব্যাকিং-এর জোরে ফুটছে দ্যাখো, গোবরে পদ্মফুল।
আধ পোয়াটাক তেল জমেছে, তাতেই জ্বেলেছে আলো।"
খবর পেলাম মুখ বেঁকালেও, আড়ালে বলেছে—'ভালো।'

আর তার পরেতেই ব্যাস্‌!
বাঙালি জাতির স্বভাব মতোই খেয়ে ফেললাম গ্যাস।
ম্যাজিক নাকি মঞ্চ ছেড়ে, উঠল স্মৃতির ফ্রেমে
টইটুম্বুর হয়ে গেলাম কবিতা লেখার প্রেমে।
প্রস্তাবক আর বাকি ওরা, বলল "আরে ওয়া!
অ্যাত্‌তোদিনে প্রকাশ পেল 'পিয়োর প্রতিভা'।
আরো লেখো তুমি, আরো লেখো
লিখেই চলো হে ভাই
কবিতার এই ঢলখানাকে কখনো থামাতে নাই।

গা-ঘেঁষে বসে বলল বুঝিয়ে,
রুমাল দিয়ে ঘামটা মুছিয়ে,
"জীবনের পথে কত না হেঁটেছ,
ম্যাজিক দেখাতে কত না খেটেছ,
এখন একটু চেয়ারে বসিয়া, জিরাইয়া লহ ভাই।
আবারও খাটতে জান-প্রাণ ভরে
প্রয়োজন মতো কিছুদিন ধরে,
বিশ্রাম নেওয়া চাই।
কবিতা লিখিবে চেয়ারে বসিয়া
কলমটা শুধু কাগজে ঘষিয়া
ছন্দ গড়িবে রসিয়া রসিয়া,
নব নব সারপ্রাইজ!
দুনিয়ার লোক হইবে ধন্য
সংস্কৃতিকে সেবার জন্য,
সাহিত্য তোমায় জোগাবে অন্ন,
পাইবে নোবেল প্রাইজ।
জ্ঞানপীঠ বা ম্যাগসাইসাই,
আকাদেমি বা অন্য
সব প্রাইজ তো ওয়েট করছে,
কেবল তোমারই জন্য।

কিন্তু এমন লোকও আছেন,
যাঁরা ম্যাজিক ভালোবাসেন,
জীবনখানা রূপকথাতে
যতটা পারেন ঠাসেন।
কলমে লেখা কল্পনা নয়,
চোখের দেখা বাস্তবময়,
দিগন্তের ঐ সীমানা ছেড়ে অবাস্তবের দেশে
হারিয়ে যাওয়ার আনন্দেতে চলে যেতে চায় ভেসে।
বললেন তাঁরা—"আরে ছ্যা ছ্যা!
এ-কি করছ অ্যাঁ!
এটা কি তোমার সাজে?
ম্যাজিক ছেড়ে কবিতা লেখা—
আইডিয়াটাই বাজে।
যার যেই কাজ, তার করা ভালো,
জাদুর প্রদীপ জ্বালিয়েই চলো,
এ-সব তুমি কি করছ?
কবিতাতে কেন মরছ?
চমকে গেলাম আমি
খাঁটি না হলেও, কথাটা এদের, নিশ্চয় খুব দামি।

নইলে দেখুন, মন-প্রাণ খুলে,
সামাজিকতার সীমারেখা ভুলে,
বদরাগী এই আমায়,
কবিতা লিখতে থামায়?!
খুলে বলি আমি, "আরে ধুচ্ছাই, পাগল হয়েছি নাকি?
ম্যাজিককে দেব ফাঁকি?!
শুধু শুধু ভেবে তোমরা এতটা সিরীয়াস কেন হচ্ছ?
ভুল কথা ভেবে তোমরা দেখছি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ।
ম্যাজিকই আমার ধর্ম, ম্যাজিকই আমার পরাণ,
জন্মলগ্নে ঈশ্বর শুধু জাদু-লাঠিটাই ধরান।
শোনো হে তোমরা ভাই
চিন্তার কিছু নাই।
ম্যাজিক করতে মন-প্রাণ ভরে,
যান্ত্রিক কিছু কৌশল নয়,
অনেক কিছুই পেরে নিতে হয়,
দেখাতে হয় তা করে।
ম্যাজিক দেখাতে প্রথমে তোমায় অভিনেতা হতে হবে,
ইমোশন বুঝে তা দিয়ে তোমার স্ক্রিপ্টটা তৈরি রবে।
কৌশলগুলো সব বিজ্ঞান, মোটেই মন্ত্র নয়,
ধর্মপথে চললেও নেই সুপারস্টেশনে ভয়।
তুক্তাক্ নেই কোনো কিছুতেই, সব কৌশলে ভরা,
নাটুকে জিনিস, সব রূপকথা, সাজিয়ে গুছিয়ে গড়া।
অভিনয়গুলো ফুটিয়ে তুলতে বাক্পটু হতে হবে।
বাক্পটু হতে পড়াশোনা কিছু তোমায় করতে হবে।
জাদুকর হতে আরো হতে হবে, করিগরী জানা মিস্ত্রী,
যন্ত্র-চালক, পুরো খুঁটিনাটি, তবেই ঘটবে Mystery.
জানতে হবে অনেক ভাষা
নানান লোকের মনের আশা,
ছন্দপতন ঘটবে খেলাতে, রিদম্ সেন্স না থাকলে,
সামাজিকতা, ধর্মের বাণী, খবর পুরো না রাখলে।
সীমানাখানা জানতে হবে, বাস্তব-সেটা কদ্দুর,
মনের আঁধার কোত্থেকে শুরু, কোথায় বা শেষ রোদ্দুর।
শরীরটাকে রাখতে হবে অ্যাক্রোবেটিক ফিট,
চরিত্রটা রাখতে হবে স্পটলেস অ্যান্ড নিট।
ম্যাজিকের এই ডেস্টিনেশন,
সব চলারই শেষের স্টেশন।
ম্যাজিক যাঁরা করেন, মানে 'মিথ্যে' যাঁদের সত্যি,
বাকি্য দিয়ে কাটাকুটি খেলা, সহজাত এক বৃত্তি।
(তবে) একেই যদি 'কবিতা' বলো, হিসেব তাহলে অন্য।
খাটতে হয় না এমন কিছু এসব লেখার জন্য।
আমি লিখে রাখি এখানে সেখানে,
প্লেনের টিকিটে, ঠোঙার পেছনে
এলোমেলো ভাবে, যেখানে সেখানে,
যখন যেমন ইচ্ছে।
আজকাল তাই, কে বা কাহারা,
সবকিছু তার দিতেছে পাহারা,
ডাস্টবিন থেকে আড়ালে তাহারা
যত্নে কুড়িয়ে নিচ্ছে।
আমাকে না বলে পুরোটা গোপনে
ছাপতে পাঠিয়ে দিচ্ছে।
আসল কথাটা কই,
আমি কবি মোটেই নই,
হঠাৎ করে, কপাল জোরে
ছন্দ মেলে, ম্যাজিক করে,
কলমটা ধরলেই।
কবি হতে গেলে প্রতিভা-ট্রতিভা
অফুরান হয় দরকার,
আমি তো নিছক জাদুকর এক—
প্রদীপ চন্দ্র সরকার।

প্রদীপচন্দ্র সরকার

যাক বাবা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বন্যার আশীর্বাদে আপাতত
গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণের কোনো আশঙ্কা নেই।

পত্রপাঠ-এর চোখে

বকু বাঙালের বকলমে

সম্পর্ক

পাশাপাশি হেঁটে আসছিল দু'টি মেয়ে। একজনের পিঠে একটি বিশাল স্কুলব্যাগ। উচ্চতা এবং চেহারায় খুব মিল দু'জনের মধ্যে। পোশাকও একই রকম। উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলছিল দু'জনেই।

মেয়েদু'টির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ঝিম্‌লি,—আচ্ছা বকু, বলো তো ঐ দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক কী হতে পারে?

আমি কিছুক্ষণ লক্ষ্য করবার পর বললাম,—মনে হচ্ছে ওরা দুই বোন, কোনো কোচিং ক্লাস থেকে ফিরছে, পিঠে ব্যাগ যার সেই মেয়েটি। অন্যজন তাকে সঙ্গ দিচ্ছে।

—দুই বান্ধবী হতে পারে না?

—না। চেহারা, উচ্চতা এবং পোশাকের ধরণ-ধারণ দেখে তা মনে হয় না।

মৃদু হাসল ঝিম্‌লি। মেয়ে দুটি কাছে এসে পড়েছিল। ঝিম্‌লি ডাকল,—মানসী, একটু শুনবে?

ওরা থামল এবং হাসিমুখে এগিয়ে এল। ঝিম্‌লি বলল,—মেয়েকে কোচিং ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছ?

আমি চমকে উঠলাম। মেয়ে!

মানসী পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে একটা চেয়ারের ওপর রেখে বলল,—না, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। ওদের একটা স্পেশাল ক্লাস ছিল।

—ঐ ব্যাগটা তুমি বইছ কেন, ওকে দাও।—ঝিম্‌লি বলল।

—ও পারে না, বড্ড ভারী। আমার অসুবিধে হয় না।—মানসী হাসল।

—না, পারি না!—মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল,—তুমিই তো বইতে দাও না। ঠিক আছে, কাল থেকে আমি পিঠে ব্যাগ নেব, তোমাকে দেব না।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে।—মানসী ব্যাগ পিঠে তুলে নিল আবার।

ওরা চলে যাবার পর ঝিম্‌লি বলল,—আজকাল পথেঘাটে জোড়ায় জোড়ায় যেসব ছেলে-মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, কোনো অপরিচিত লোক তাদের দেখে বলতে পারবে না তাদের মধ্যে কী সম্পর্ক। প্রসাধন, চেহারা, সাজপোশাক এবং আচরণ, বিশেষ করে মেয়েদের, অনেকের বয়েস অন্তত দশ বছর কমিয়ে দিয়েছে। আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে নিজের পরিচিত এলাকা থেকে দূরে গেলেই তখন আর কোনো আড়ষ্টতা থাকে না।

—তাই বলে নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটা ভুলে যায় না নিশ্চয়ই।—আমি বললাম।

—হয়ত তাই।—ঝিম্‌লি বলল,—কিন্তু পথেঘাটে তাদের দেখে একজন অচেনা লোক কি সেটা বুঝতে পারে? এই তো তুমি নিজেই মানসী ও তার মেয়েকে দেখে বুঝতে পারলে না ওদের মধ্যে কি সম্পর্ক।

—কেউ কেউ মজা পায় নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক লুকোতে, বাইরের লোকদের কাছে।

—পায়ই তো।—মৃদু হেসে বলল ঝিম্‌লি,—আমি এমন মেয়েদের জানি যারা প্রায়ই স্টাইল করে সেজে সন্ধের পর তাদের বাবাদের সঙ্গে বেরোয় মোটর বাইকে চেপে বাবার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। তাদের দেখে, কথাবার্তা শুনে ও আচরণের উচ্ছলতায় কে বুঝবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কী? আদুরে মেয়ের আব্দারকে প্রশ্রয় দিতে দিতে ব্যাপারটা দু'জনের কাছে নেশার মতো দাঁড়িয়ে যায়।

—আজকাল কেউ আর মাথা ঘামায় না এ নিয়ে।—আমি বললাম,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে তিনটে সুন্দরী, স্মার্ট মেয়ে। ওদের কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক তা জেনে লাভ কি?

শেষপাত

আমু

হোর্ডিঙে বলা আছে কত কাজ করলাম তোমাদের জন্য!
বিজ্ঞাপনের ব্যয় বেশি তৎসত্বেও সবক'টা কাগজে
দিয়েছি, আমার কাজ দেখেশুনে ক্লিনটন হিলারিও ধন্য!
এসব তথ্য নিয়ে হে বাঙালি তুলে রাখো তোমাদের মগজে।

ফুটবলে NO BALL

প্রণব হোড়

[redacted]

পত্রপাঠকদের জন্য

শ্রেণিবদ্ধ

প্রলাপের সেরা মাধ্যম

[redacted]

বিউটি পার্লার

সুন্দরী হতে চান? কোন নায়িকার মতো সুন্দরী হতে চান, শুধু সেইটুকু বলুন। পাঁচ মিনিটে আপনার মুখ বদলে যাবে। সব বাঘা বাঘা সুন্দরী নায়িকাদের মুখের আদলে মুখোশ থরে থরে আমাদের দোকানে সাজানো আছে। সেট করতে মাত্র পাঁচ মিনিট।

সম্ভব বিউটি ক্লিনিক। রোগা থেকে মোটা মোটা থেকে রোগা, বেঁটে থেকে লম্বা, লম্বা থেকে বেঁটে। যেমনটি হতে চান তেমনটিই করে দেওয়া হয়। পদ্ধতি খুবই সহজ। যেমন—বেঁটে থেকে লম্বা। জুতিয়ে লম্বা করে দেওয়া হয়।
লম্বা থেকে বেঁটে—পি সি সরকারের পদ্ধতি অনুসারে মাথায় বিশমণি হাতুড়ি মেরে বেঁটে বামন করা হয়।
মোটা থেকে রোগা—নামমাত্র খাইয়ে তিন মাস কোনোক্রমে প্রাণটা টিকিয়ে রাখা হয়। স্লিম বলে স্লিম! ফিরে আয়নায় দেখবেন হাড়-চামড়া ছাড়া কিছুই নেই আর আপনার শরীরে।
রোগা থেকে মোটা—খুবই সহজ। পুরাতন পুলিশি

বিউটি পার্লার

দাওয়াই। কম্বল ধোলাই। সারা গা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। গব্বর সিংকেও হার মানানোর গ্যারান্টী।

শিক্ষা

পরীক্ষায় টুকতে গিয়ে নাকাল হচ্ছেন? গার্ডরা বার বার আপনার পকেট হাতড়ে কাগজ বের করে নিচ্ছেন? কোনো চিন্তা নেই। চলে আসুন সোজা আমাদের সলিউশন সেন্টারে। এমন প্যান্ট বানিয়ে দেব যে তার কোথায় কোন গুপ্ত পকেট তার হদিশ করতে গার্ডের একসপ্তা অন্তত হোমওয়ার্ক করতে হবে। প্রখ্যাত দর্জি খলিফা হারুণ এই কাজের দায়িত্বে আছেন। তার সঙ্গে মাইক্রো জেরক্সের সুবন্দোবস্ত আছে। এমনই মাইক্রো যে খালি চোখে সাদা কাগজ বলেই বোধ হবে। সে কারণে আছে নানাবিধ চশমা ও কন্ট্যাক্ট লেন্সের সুবন্দোবস্ত, যা কিনা আপনাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ করে দেবে। ঘন ঘন চশমা বা লেন্স বদলাবার এবং গার্ডকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর ট্রেনিংয়েরও সুবন্দোবস্ত আছে। মাত্র ২০০০ টাকার বিনিময়ে সারা জীবন নিশ্চিন্তে টোকার গ্যারান্টী। ট্রেনিং কোর্সে আসন সীমিত। আজই যোগাযোগ করুন। আগে এলে আগে সুযোগ।

পেয়িংগেস্ট

হ্যান্ডসাম, উচ্চশিক্ষিত, অবিবাহিত, সুচাকুরে দাবীহীন পেয়িংগেস্ট চাই।

বিপত্নীক, নিঃসন্তান, নিঃসঙ্গ মধ্যবয়সী, সুঠামদেহী, উচ্চমধ্যবিত্ত ব্যক্তির বাড়িতে সুন্দরী অনূর্ধ্বা ৩৫ পেয়িংগেস্ট চাই।

হার্বাল

চুলের গোড়া শক্ত করতে আমাদের এলিফ্যান্ট তেল ব্যবহার করুন। চুলের গোড়া এমন শক্ত হবে যে গাড়ি কেন, গোটা একটা হাতির শুঁড়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন। যাঁদের স্বামীরা চুলের মুঠি ধরে টান মারেন তাঁরা স্বামীকে চুলে বেঁধে টানতে টানতে অক্লেশে থানায় নিয়ে যান।

ডিভোর্স

অন্য নারীর আকর্ষণে পাগল হয়ে ডিভোর্স চাইছেন কিন্তু আপনার স্ত্রী কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না? তাহলে আর দেরি না করে আমাদের সংস্থায় চলে আসুন। আদতে হাড়-হাভাতে হলেও অভিনয়ে দক্ষ—কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ডাক্তার, কেউ এন আর আই, কেউ শিল্পপতি—কেউ না কেউ আপনার স্ত্রীকে মোহমুগ্ধ করবেনই। তখন আপনাকে আর ডিভোর্সের মামলা করতে হবে না, আপনার স্ত্রীই ডিভোর্স চাইবেন। রেজিস্ট্রেশান ফী ৫০ হাজার। ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর বাকি ৫০ হাজার। বি. দ্র. —কার্যসিদ্ধির পর বাকি ৫০ হাজার টাকা না

ডিভোর্স

দিলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তীব্র বশীকরণ। মাত্র পাঁচ মিনিটে। ডিভোর্সে অনিচ্ছুক আপনার স্বামী বা স্ত্রীর ফটো নিয়ে আসুন। তন্ত্র ও ইন্টারনেটসিদ্ধ নেটায়ু বাবা গ্যারান্টী সহকারে বশীকরণ করে থাকেন। ডিভোর্সের তীব্র বিরোধী জাতক/জাতিকা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফস্ করে বশ হয়ে ডিভোর্সে রাজি হবেন। ইমেল যোগেও প্রতিকার করা হয়। তবে ফিমেলদের (বিশেষত সুন্দরী এবং অল্পবয়স্কা বা মধ্যবয়স্কা রমণীদের ক্ষেত্রে চিরকুমার নারীবিমুখ ব্রহ্মচারী নেটায়ু বাবা সাক্ষাতেই অধিক আগ্রহী।

টিউশন

আমার পুত্র শ্রীমান নিরীহর (তৃতীয় শ্রেণী, বাংলা মাধ্যম) জন্য উচ্চ বেতনে গৃহশিক্ষক চাই। আপনার চশমা ভাঙলে নতুন চশমা, দাঁত ভাঙলে দাঁতের সার্জারি এবং দাঁত বাঁধিয়ে দেওয়া—এসব দায়িত্ব নিতে পারব না। ইতিপূর্বে পাঁচজন গৃহশিক্ষকের পেছনে এইসব খরচ করতে করতে আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। সত্বর আবেদন।

পত্রপাঠের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এ ধরণের যে কোনো শ্রেণীবদ্ধ প্রলাপ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাপা হয়। কোনো টাকা-পয়সার ব্যাপার নেই। আপনারা নিশ্চিন্তে গাদা গাদা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন পাঠান। আপনার আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু কিংবা শত্রু—যে কারো বিজ্ঞাপনই বিনামূল্যে ছাপা হবে, যদি আপনি সুপারি, খুড়ি, সুপারিশ করেন।

কইতে কথা আর বাধছে না

সমরেশ মজুমদার

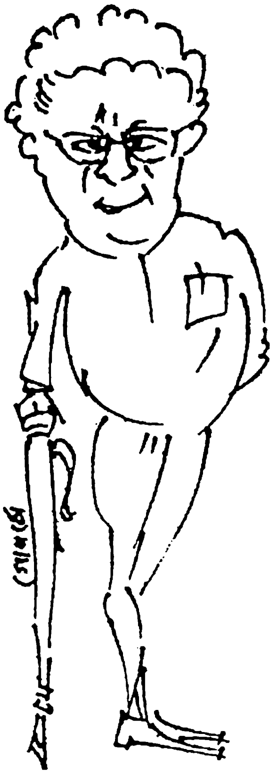

> এই জনপ্রিয়তা হুমায়ূন একদিনে পায়নি। সে বাংলাদেশে পাঠক তৈরি করেছিল বলেই সুনীলদা, শীর্ষেন্দুদা বা আমার লেখা ওখানকার পাঠকরা গ্রহণ করেছেন।

আনন্দের খবর, খুশির খবর। কিন্তু একই সঙ্গে দুঃখের খবর, কষ্টের খবর। মহাজ্ঞানীরা বলে গেছেন, এইটাই জীবন। হয়ত। হয়তই বা বলি কি করে? এটাই স্বাভাবিক। ডান হাতের পাঁচ আঙুল যখন প্রসারিত হতে চায় ঠিক তখনই বাম হাতের পাঁচ আঙুল সঙ্কুচিত, মুঠো হয়ে আফশোষে জড়ায়। তবু খুশির খবর দিয়েই এবারের লেখা শুরু করা যাক।

এক দুই করে শেষ পর্যন্ত এক যুগ পার করে তেরো বছরে পড়ল পত্রপাঠ। ভাবা যাচ্ছে না। একেবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এমন সাফল্য পেতে পারে? সাধারণ পরিবারের একটি ছেলে, যার জীবিকা অধ্যাপনার, সে প্রতি মাসে কোন দায়বদ্ধতায় পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে যার মান কখনো নিম্নমুখী হয়নি? ব্যবসায়িক বা বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কেউ কেউ মাঝে মাঝে হয়ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তা প্রয়োজনের চেয়ে খুবই কম। শেখর আহমেদকে নির্ভর করতে হয়েছে আপনাদের ওপর, এই পত্রিকা যাঁরা কিনে পড়েন, এই পত্রিকাকে যাঁরা ভালোবাসেন। সেই নির্ভরতা তাকে প্রকাশ-খরচের অর্ধেকটা হয়ত দিয়েছে। বাকি অর্ধেকের জন্যে সে বঞ্চিত করেছে নিজের পরিবারকে, ভবিষ্যৎকে। কেন?

আজ থেকে তেরো বছর আগে যখন সে আমার কাছে পত্রিকা-ভাবনা নিয়ে এসেছিল তখন আমি তাকে "অচলপত্র"র গল্প শুনিয়েছিলাম। সেসময় ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল না, পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও খুব কম ছিল। ফলে দীপ্তেন সান্যালের অচলপত্র জনপ্রিয় হয়েছিল সহজেই, কারণ বাঙালি একটি মজার ছলে সমালোচনার কাগজ পেয়েছিল। শেখরকে লড়াই করতে হয়েছে বহুগুণ বেশি। তাই জনপ্রিয় পত্রিকার সাইনবোর্ড না পেলেও রসিক পাঠকদের কাছে তার কাগজ বিশেষ মর্যাদা পেয়ে গেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবিষ্কার করলাম, দু'টি সংখ্যা অসুস্থতার কারণে বাদ দিলে এই বারো বছরের প্রতিটি সংখ্যায় আমি লিখেছি। অবশ্যই শেখরের তাগাদায়। এই একশ বিয়াল্লিশটি লেখা কেন লিখলাম? পত্রিকার জগতের মানুষেরা জানেন আমি প্রফেশন্যাল লেখক, লিখে শুধু সংসার চালাই না, আরো একটু ভালো থাকতে চাই। তাঁরা বিশ্বাস করেন, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শেখরকে একটি লেখা প্রতি মাসে দিই। অন্য কাগজের ক্ষেত্রে এটা খুব স্বাভাবিক ভাবনা হত। কেন মিছিমিছি আমি মাসের পর মাস লিখে যাব! কিন্তু "পত্রপাঠ" সম্পর্কে আমারও যে কিছুটা দুর্বলতা থেকে গিয়েছে। যাকে আমি নৌকা ভাসাতে বললাম, তার হাতে দাঁড় তুলে দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য, এটা অস্বীকার করি কি করে?

তবু আনন্দ। তেরো বছরে পা দিয়েছে পত্রপাঠ। বঙ্কিমের নায়িকা তো তেরো বছরেই প্রেমের উপযোগী হয়ে উঠত। পত্রপাঠের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, বালকবেলা কাটিয়ে এখন কিশোরবেলায় পা দিয়েছে। কিশোর কখন তরুণ হয়ে ওঠে ঠিক বোঝা যায় না। পত্রপাঠের বেলাতেও সেই সময়টার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম।

> শেখর আহমেদকে নির্ভর করতে হয়েছে আপনাদের ওপর, এই পত্রিকা যাঁরা কিনে পড়েন। সেই নির্ভরতা তাকে প্রকাশ-খরচের অর্ধেকটা হয়ত দিয়েছে। বাকি অর্ধেকের জন্যে সে বঞ্চিত করেছে নিজের পরিবারকে, ভবিষ্যৎকে। কেন?

এবার দুঃখের খবর। উনিশে জুলাই রাত্রে চলে গেলেন হুমায়ূন আহমেদ। প্রায় পঁচিশ বছরের পরিচিত হাসিখুশি স্বল্পভাষী আমার এই বন্ধুটি হেরে গেলেন ক্যানসারের কাছে। রোগ ধরা পড়েছিল বছরখানেক আগে। ঢাকা থেকে উড়ে গিয়েছিলেন নিউইয়র্কে চিকিৎসার জন্যে। মাঝে খবর পেয়েছিলাম, রোগ মাথা নত করেছে, হুমায়ূন নিরাময়ের পথে। কিন্তু আবার শরীরের অন্য জায়গায় মাথা চাড়া দিল রোগ, যা আর সামলাতে পারল না সে।

অনেকদিন থেকেই আমার একটা আক্ষেপ ছিল। হুমায়ূন আহমেদ বাংলা ভাষার মুকুটহীন বাদশা। পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বাঙালি নেই এবং সেই বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় লেখকের নাম হুমায়ূন আহমেদ।

এই বাঙালি, যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলেন, পড়েন, তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়, তিনি বাংলাদেশি। এই জনপ্রিয়তা হুমায়ূন একদিনে পায়নি। সে বাংলাদেশে পাঠক তৈরি করেছিল বলেই সুনীলদা, শীর্ষেন্দুদা বা আমার লেখা ওখানকার পাঠকরা গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের শতকরা পঁচিশ ভাগ মানুষ কিছু না কিছু পড়েন।

অথচ আমাদের পশ্চিমবাংলার চেহারা অন্যরকম। খুব কম সংখ্যক মানুষ এখানে বই পড়েন। যাঁরা নিত্য খবরের কাগজ পড়েন তাঁদের অনেকেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের তিনটি বইয়ের নাম বলতে পারবেন না। বাংলার বাইরে যেসব পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি আছেন তাঁদের একশজনে দু'জন বাংলা বই পড়েন কি না তাতেও সন্দেহ আছে।

আক্ষেপ অন্য কারণে। পশ্চিমবাংলার পাঠক, যাঁরা আমাদের বই পড়েন, তাঁরা এক ধরণের অস্বাচ্ছন্দ্যে আক্রান্ত। উপন্যাসে মুসলমান নাম থাকলে সেই অস্বাচ্ছন্দ্য শুরু হয়। তারপর যদি চরিত্রগুলো নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, 'আপা' 'দুলাভাই' ইত্যাদি সম্বোধন করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ করে ফেলেন তাঁরা। 'জল'কে 'পানি' বললে তাঁদের তীব্র আপত্তি, কিন্তু জলের ফলকে তাঁরাই হাসিমুখে পানিফল বলে থাকেন। অথচ আমাদের উপন্যাসে হিন্দু দেব-দেবীর বর্ণনা বা পূজাপাঠের কথা থাকলে মুসলমান পাঠকদের রসগ্রহণে একটুও অসুবিধে হয় না। নজরুল কীর্তন লিখেছেন, শ্যামাসঙ্গীত লিখেছেন, গেয়েওছেন।

এই আড়ষ্টতার কারণে, এই সীমাবদ্ধতার কারণে পাশের রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তম লেখকের সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার গরিষ্ঠ পাঠক আজও উদাসীন হয়ে আছেন। এতে হুমায়ূনের কিছু এসে যাবে না। এটা পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদেরই লজ্জা।

হুমায়ূন নেই। আছে ওর জন্যে দুঃখ, কষ্ট। আর আমাদের কারণে আক্ষেপ।

হেঁসেল

পদীপিসি কথিত

তোগার সোম্পাদোকের খাওয়া হোচ্চেনে? আহাহা! বেচারা কতো কষ্টো কোরে বারো বচোর ধোরে কাগোজ কোরতেচে! তা, ও পোরাণের মা, আমি বরোং ভালোমোন্দো এঁদে দিই, তুই নোকটারে খেইয়ে আয়। কী বোললি? কাগোজ বন্দো কোরে দোরে তালা এঁটে পেইলে গেচে? যাঃ, ত্যাবে আর কারে খাওয়াবি? এই তোগার সোম্পাদোকের এক ব্যামো। থেকে থেকে পেইলে যায়। অ্যাঁ! সক্কোলে মিলে খুঁজে ধোরে এনেচে! বেশ বেশ! খুব ভালো কোতা। ত্যাবে কিনা তুই মাজেমোদ্যি এসে আমার মাতা খাবি, আর গালমোন্দো শুনে সেইগুনো নিকে নিকে ছাপাবি। তা আর কি করা যাবে। তা, ত্যাবে সোম্পাদোক খেতি পারতেচে না ক্যান? সব্বাই মিলে মুকে গামচা বেঁদে একেচে? হায় হায়, কিজন্যি রে? মুক খুলতি দিলি খালি কাগোজ বন্দো কোরে দেবার কতা বোলতেচে? ত্যাবে বেশ কোরেচে। যতোক্ষোণ না এই অলুক্ষুণে কোতা মুক থে বিদেয় হয় ততোক্ষোণ খাওয়া-দাওয়া বন্দো কোরে রাক মিন্সের। ক'মাস অন্তোর অন্তোর খালি সেই এক ধুয়ো তোলা! বুড়োর আর কাজকম্মো নিই, খালি বন্দো কোরি বন্দো কোরি বোলে হেদিয়ে মোরতেচে! ঝেঁটা মার! ত্যাবে তার সাতে এ কোতাও বোলিস যে ওই বন্দো কোরার অলুক্ষুণে কোতা যকোন মুক থে চেরোকালের মোতোন বিদেয় কোরতি পারবে, আমার ঘরে বুড়োর নেমোন্তোন্নো বাঁদা ওইলো। ভালোমোন্দো এঁদে পোরাণ ভোরে খাওয়াবো। সিদিন তুইও আমার সাতে আঁদাবাড়ায় যোগ দিস। অ্যাকোন দেকে আয়দিনি বুড়োর কাগোজ বন্দো কোরার ব্যামো ছাড়লো কি না!

অনুলেখন   পরাণের মা

স্বনামধন্য মনোবিদ্ ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য
শুধু চিকিৎসক এবং চিত্রশিল্পীই নন,
চিকিৎসার এবং তুলির মতো তাঁর কলমেও জাদু আছে।

"যারা মাঝখানে জড়ো, পেটমোটা তারা স্বাভাবিক মাঝারি, সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর দু-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংখ্যালঘু উঁচু অথবা নিচু প্রজাতি। শান্তনু কি নিচু প্রজাতির? পোকারাও?"

যত হাসি, তত অশ্রুজলের মিশ্র অনুভবের এক অনন্য দিগন্ত—
একেবারেই আলাদা স্বাদের একডজন গল্প নিয়ে

অসম্পূর্ণ দলিল ৬০্

কবিতা পাক্ষিক

৪৯ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

অনৈক তান

অঙ্কন প্রণব হোড়

রসপাষণ্ড

বিপুল এ কলকাতার কোন পথে চলি
দিকে দিকে কত না সরণি, কানাগলি।
সি এম সি-র কত কীর্তি, কত রাস্তা, মোটা লম্বা সরু,
কত না পথের কুত্তা, কত না বেওয়ারিশ গরু,
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল ট্রাফিক কন্‌জেশসন
রাস্তাঘাট জুড়ে থাকে, নাহি জানি কাটিবে কখন।
সেই রাগে পড়ি পেপার, ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
বিপুল উৎসাহে—
যেথা পাই গুল মারা কেচ্ছার কাহিনী
কান পেতে শুনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি রাস্তাঘাটে শুনে।।

আমি কলকাতার লোক, যেথা যত রসের কাহিনী
আমার অফিসঘরে আলোচনা চলিবে তখনি।
ট্রামে-বাসে জানিল না কখন যে পকেট বেবাক
হয়ে গেছে ফাঁক।
অল্প নয় শুনি কানে ক্লাবের চাঁদার পরিমাণ
কত না পূজার দিনে ঠাণ্ডা করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্দান্ত পাড়ার হীরো অশ্লীল নিঃশঙ্ক ভঙ্গিমায়
অশ্রাব্য যে গান গায়
আমার পশ্চাতে বার বার
শানায়েছে আক্রমণ তার।
পূজার প্যান্ডেল শীর্ষে যে মাইক খাড়া
মহাশব্দ পূর্ণতায় রাত্রিদিন কাঁপাইছে পাড়া,
সে আমার দীর্ঘরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ শব্দের কীলকে।
বম্বেমার্কা সিনেমার প্রচণ্ড ঘর্ঘর
রন্ধ্রের গহন অব্দি পাঠায়েছে স্বর।
কলকাতার জনগণস্রোতে
নানা ট্রেন ঢালে লোক নানা দিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
ধাক্কা খাই সবাকার, ঘামের দুর্গন্ধ করি ভোগ।
নিত্য কলকাতার আমি পাই তো প্রসাদ
রেশনের কাঁকরের স্বাদ।

সবচেয়ে দুষ্কর্ম যে ঘুষ গোপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে যন্ত্রণাময়
টঙ্কাটি খসালে পাবে তার অন্তরের পরিচয়।
নাই যে অন্যত্র আর প্রবেশের দ্বার,
বাঁধা হয়ে আছে জোর ভেড়াগুলি আসল কর্তার।
ও সি খেতে চাহিতেছে মাল
নেতা কষে বাত ভণে, মন্ত্রী চালে চাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।।
অতি ভদ্র বংশ তার, জনতার ভোটে নির্বাচনে
রাইটার্সের উচ্চমঞ্চে বসিয়াছে মন্ত্রীর আসনে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি তাহাদের চেম্বারের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি হয়নি একেবারে।
গোপনে চালান কিছু করা
নাহলে চাকরির জন্যে ব্যর্থ হয় হন্যে হয়ে ঘোরা।
তাই আমি মেনে নিই সে ঘেন্নার কথা—
আমার গুণের অক্ষমতা।
আমার ক্ষমতা জানি আমি।
পেলেও সে ছিদ্রপথে হই নাই সে চাকুরিকামী।

কলকাতার জীবনের মালিক যে জন,
ধর্মঘট ক'রে নিত্য টু পাইস করিছে অর্জন,
যে আছে পার্টির কাছাকাছি
সে নেতার বাণী লাগি কান পেতে আছি।
কলকাতার নেতাদের পোজে
নিজে যা পারোনি হতে নিত্য তুমি থাকো তাই সেজে।
যত মিথ্যে হোক
শুধু ভড়কি দিয়ে বেশ ভোলাচ্ছ লোক।
সত্যি কিছু না করেই নেতৃত্বের অতি বাহাদুরি
মন্দ নয় মন্দ নয় নকল এ মৌখিক জোচ্চুরি।।

এসো নেতা, কলকাতা জনের
বেকুব মনের
মর্মের বাসনা যত করহ প্রচার।
বাতিহীন এ শহরে গতিহীন যেথা চারিধার
ট্রাফিকের চাপে রুদ্ধ, খানা-খন্দ, জলে ভরা ভূমি
প্রসেশনে পূর্ণ করো তুমি।
অন্দরে যে পুচ্ছ তব আছে আপনারি
তাই তুমি দাও উচ্চ করি।
কলকাতার ময়দানের মহতী সভায়
এল যারা ভাড়া হয়ে, তারাও পাওনা যেন পায়।
মুর্খ যারা বিড়ি ফুঁকে
চামচাগিরি করে যারা তোমার সম্মুখে,
কাছে থেকে দূরে গেলে তাহাদেরই গালাগালি শুনি।
তুষ্ট থেকো তাহাদের প্রতি
তোমার প্রাপ্তিতে তারা হয় যেন আনন্দিত অতি—
আমি বারংবার
তোমারে কহিব—চমৎকার।।

এস এম এস সমাচার

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শাড়ি-সায়া খুলে স্ত্রী সান্টাকে জিজ্ঞেস করল,—এবার কী করতে হবে তা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না?

সান্টা রেগে গিয়ে বলল,—এত রাতে তোমার জামা-কাপড় কাচতে পারব না।

❋ ❋ ❋

শিক্ষক মুরগি আর মানুষের মধ্যে প্রভেদ কি?

ছাত্র মুরগিকে কিছুতেই মানুষ করা যায় না, কিন্তু মানুষকে একটু চেষ্টা করলেই মুরগি বানানো যায়।

❋ ❋ ❋

শিক্ষক রজনীকান্তের "দি রোবট" সিনেমা দেখে তোমরা কী শিখলে?

জনৈক ছাত্র মেয়েরা শুধু মানুষের মাথা নয়, মেশিনেরও মাথা খারাপ করে দিতে পারে।

❋ ❋ ❋

দাদু ওরে তোর মাস্টারমশাই আসছে, এবার চুপ কর।

নাতি আগে তুমি চুপ হয়ে যাও, তোমার মরে যাওয়ার গল্প ফেঁদে দু'সপ্তার ছুটি চেয়েছি।

❋ ❋ ❋

স্ত্রী তুমি প্রেম করতেই জানো না।

স্বামী তাহলে এই তিনটে বাচ্চা কি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছ?

স্ত্রী তা কেন, ও তো আর একজনের পেনড্রাইভ থেকে নিয়েছি।

❋ ❋ ❋

একটা মদের দোকানে একটি মদের বোতলের ছবিতে লেখা—যদি তুমি কারো প্রেমে পড়ে থাকো, তবে আমার প্রেমেও একদিন না একদিন তোমাকে পড়তেই হবে। তার চেয়ে দেরি না করে আজ থেকেই প্রেমটা শুরু করো।

❋ ❋ ❋

পরীক্ষার হলে শিক্ষক তোমাদের এত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন? কী সমস্যা? রোল নাম্বার মনে নেই? অ্যাডমিট আনতে ভুলে গেছ? নাকি ক্যালকুলেটার?

ছাত্র ধ্যাত্তেরি! চুপ করবেন একটু? পরেরদিনের পরীক্ষার চোতা নিয়ে চলে এসেছি। কী যে করি!!

❋ ❋ ❋

বিবাহিত জীবন এমন কিছুই না। ঘাবড়াবার কিছুই নেই। এ হল একটা পার্কে বেড়ানোর মতো। সমস্যা শুধু একটাই—পার্কটা হল জুরাসিক পার্ক।

❋ ❋ ❋

কলিকাতার কালীঘাটের কালীচরণ কর্মকারের কনিষ্ঠা কন্যা কমলকলি কর্মকার কপাল কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—কালু কাকা, কালু কাকা, কাক কেন করে কা-কা?

❋ ❋ ❋

বাংলা শিক্ষক বলো তো, "রামবাবুর ছেলে রাত জেগে ফ্যাশান টিভি দেখে।"—এখানে ফ্যাশান টিভি কী কারক?

ছাত্র ক্ষতিকারক স্যার!

—সৌমেন মিত্র

যারা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় তারা হয় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, গবেষক....।

যারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় তারা হয় প্রশাসক। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণরা এদের অধীনে কাজ করে।

যারা তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় তারা হয় রাজনীতিবিদ এবং মন্ত্রী। প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী দু'জনেই এদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

যারা ফেল করে যায়, তারা হয় মাফিয়া। তারা ঐ তিনটি শ্রেণীকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।

এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ টুপ্‌টাপ্ নিরুদ্দেশ হয়ে বিদেশে চলে যায়। তারা হল NRI অর্থাৎ Non Required Indian।

❋ ❋ ❋

তুতুলকে অঙ্ক শেখানো হচ্ছে। সেদিন টিউটর এসে পাঁচের ঘরের নামতা শিখিয়ে গেছেন। এবার মায়ের পড়া ধরার পালা।

মা তুতুল, পাঁচের ঘরের নামতা বল।

তুতুল গড়্‌গড়্ করে সব ঠিকঠাক বলে গেল।

মা বাঃ, খুব ভালো! এবার চারের ঘরের নামতা বল।

তুতুল হোঁচট খেল।

মা সে কি! তুই পাঁচের ঘরের নামতা শিখেছিস, আর চারের ঘরেরটা বলতে পারছিস না?

তুতুল দ্যাখো না মা, মিস্ আমাকে পাঁচের ঘরের নামতা শিখিয়েছে কিন্তু চারের ঘরেরটা ভুলিয়ে দিয়েছে।

❋ ❋ ❋

শিক্ষক তোতন, তোমার বয়স কত?

তোতন সাত বছর।

শিক্ষক আর তোমার বাবার বয়স?

তোতন সাত বছর।

শিক্ষক (রেগে গিয়ে) তোমারও বয়স সাত, তোমার বাবারও বয়স সাত?

তোতন বাঃ, আমার জন্মের পরই তো আমার বাবা তোতনের বাবা বলে পরিচয় পেল। তার আগে তো বাবার আলাদা নাম ছিল।

—করলা মিত্র

অঙ্কন বিপ্লব ভট্টাচার্য

শচীনকত্তা কী কইলেন

কত্তার পর পর দুইখান ছবি ফ্লপ করছে। কত্তার ম্যাজাজ বিলক্ষণ খারাপ। কিন্তু আমারও তো কোনো উপায় নাই। সম্পাদকের কৃপায়, মাছ-মাংস দূরে থাকুক, দুই বেলা নুন আর ভাত জুটতাছে (সম্পাদকের নাকি তাও জুটে না, এসব নিন্দুকের রটনা বৈ না) তাও মাঠে মারা গ্যালে বাঁচুম কী কইর‍্যা? অতএব পরাণডা হাতে কইর‍্যা কত্তার আপিসে হানা দিলাম। কত্তা তখন এক পরিচালকরে ধমকাইতাছেন,—কী শিখছস ফিল্ম ডিরেকশনের? আধুনিক ফিলিম বানাইবার পারস না?

আমি কাচমাচু মুখে জিগাইলাম,—কত্তা, আপনের ছবি কি ফ্লপ করছে?

কত্তা দাঁত খিঁচাইয়া কইলেন,—ফ্লপেরে মারো গুলি। আমার ফিলিম আশানুরূপ সাকসেস হয় নাই। এইসব পাতি ডিরেক্টাররা আর কাহিনী লেখকরা আধুনিক ভাবনা ভাইবতে পারে না।

ডিরেক্টার মহাশয় মিন্ মিন্ কইর‍্যা কইলেন,—স্যার, আধুনিক ছবিই তো বানাইছি! "উন্মুক্ত পোশাক", "মধ্যরাতে পাশের বাড়ির বৌদি"

কত্তা বাধা দিয়া কইলেন,—তোমাগো ভাবনা সব মান্ধাতা আমলের। পোস্ট মডার্ন ফিল্ম বানাইবার পারো না?

ডিরেক্টার জিগাইলেন,—হেইডা কেমন স্যার?

কত্তা কইলেন,—"ঢিল মারি তর খোলার চালে", "হনুমানের বগল খেউরি"। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডিরেক্টার কইলেন,—ইসব তো শুনা যায়। কেউ কি কখনো ইসব লইয়া ফিলিম করছে?

কত্তা কইলেন,—হ। মোটা মাথা ইজন্যই কয়। ইসব হইল তখনকার পোস্ট পোস্ট পোস্ট মডার্ন ভাবনা। আইজকে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। আমার পরের ফিলিম হইব—"রাতকানার রাত্রিদর্শন"।

দ্যাখলাম ডিরেক্টার মশয় খাবি খাইতাছেন। কত্তা সেদিকপানে দৃষ্টিপাত কইর‍্যা কইলেন,—তগো সম্পাদকরে ক' আমার থিক্যা থিম ধার কইর‍্যা সংখ্যা বাইর করতে। নইলে এ পত্রিকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এমন সময় সম্পাদকের ফোন আইল,—নূতন চিন্তায় কত্তার ইন্টারভিউ লইছস?

আমার কণ্ঠরোধ হইল। —অচিন ভর্তা

এস এম এস সমাচার

বান্ধবী কাছে থাকলে হোটেলের বিল। বান্ধবী দূরে থাকলে মোবাইলের বিল। আর একেবারে দূর হয়ে গেলে? মদের বিল।

নীতিবাক্য দিও না দিল
আসবে না বিল।

❋ ❋ ❋

সর্দারনি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গরম হালুয়া পরিবেশন করতে এল অতিথিদের। সর্দারজি চেঁচিয়ে উঠল,—অ্যাই বেহায়া! তুমি কি স্বাভাবিক আছ?

সর্দারনি হেসে উত্তর দিল,—ও-জি! রেসিপি বুক-এ লেখা আছে, গরম গরম পরিবেশন করবে, কোনো ড্রেসিং না করেই।

❋ ❋ ❋

কখনো ষাঁড়ের সামনে দাঁড়াবে না। গাধার পেছনে দাঁড়াবে না। আর পাগলের কোনো ধারেই দাঁড়াবে না। আর তোমার রাগী বৌয়ের? মনে রেখো, তিনি হলেন এই তিনের সমাহার। এবার তোমার ইতিকর্তব্য তুমিই ঠিক করে নাও!

❋ ❋ ❋

ছেলেদের প্রতি মেয়েদের উক্তি—

১৯৭০—আমায় ভালোবাসো, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করবে না।

১৯৮০—আমায় স্পর্শ করো, কিন্তু খবরদার চুমু খাবে না।

১৯৯০—চুমু খাও, কিন্তু তার বেশি কিছু করবে না বলে দিচ্ছি।

২০০০—যা খুশি করো, কিন্তু কাউকে বলবে না।

২০১০—সবকিছুই করো, নাহলে আমি সবাইকে বলে দেব যে তোমার দ্বারা কিছুই হয় না।

❋ ❋ ❋

আওরঙ্গজেব সেনাপতি, শিবাজির হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

সেনাপতি জাঁহাপনা, আমাদের মুগ্‌ল সার্চে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। একবার গুগ্‌ল সার্চ করে দেখব?

—ওয়ে টু এস এম এস

অঙ্কন প্রণব হোড়

কচিগল্প

প্রথম রাতেই

রসপাসণ্ড

বিয়ের সময় উমাচরণকে তার বন্ধুরা পই পই করে শিখিয়ে দিয়েছিল—প্রথম রাতেই বেড়াল মারবি। নইলে কিন্তু বৌ শাসনের বাইরে চলে যাবে। সারা জীবন পস্তাতে হবে।

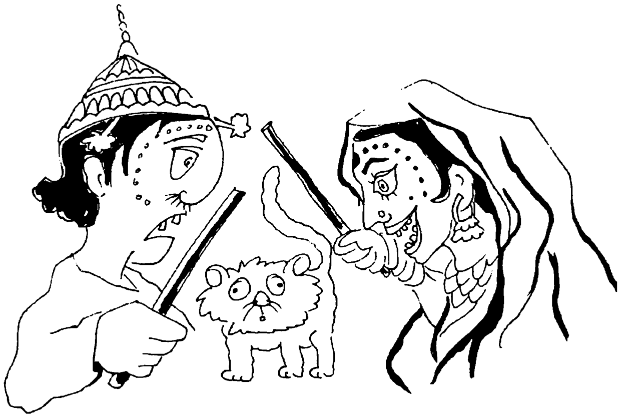

কথাটা উমাচরণ মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিল। প্রথম রাতে বেড়াল সে মারবেই মারবে। প্রথমটায় অবশ্য একটু খটকা লেগেছিল,—কিন্তু কাছে-পিঠে যদি কোনো বেড়াল না পাওয়া যায় তবে কি হবে?

—উজবুক, বেড়াল মারা মানে কি সত্যি সত্যি একটা বেড়ালকে মেরে ফেলা! কথাটা হল রূপক। প্রথম রাতেই বৌকে এমন কড়কে দিবি যে বৌ একেবারে কেঁচো হয়ে যাবে। সারা জীবন তোর বশে থাকবে।

উমাচরণ সেইমতো তৈরি। ফুলশয্যার রাতের প্রথম দিকের কাজকর্ম হয়ে যাবার পর উমাচরণ বেশ গম্ভীর গলায় বৌকে বলল,—বেয়াদপি আমি একদম পছন্দ করি না। আমার সকালে গরম জলে চান করার অভ্যেস, তুমি সক্কালে উঠে আমার জন্যে এক বালতি জল গরম করে রাখবে। নইলে—।

উমাচরণ বাকি কথাটা উহ্য রেখে দিল। লোকে বলে একরকম মাঝপথে বাকি কথা উহ্য রেখে দিলে নাকি কথার ওজন বাড়ে।

উমাচরণ আশা করেছিল তার কথার ওজনের ভারে চাপা পড়ে বৌ চুপ মেরে যাবে আর সারা জীবনের মতো বশে এসে যাবে। কিন্তু ঘটনাটা তার আশা অনুযায়ী ঘটল না। নতুন বৌ ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর হিমশীতল কণ্ঠে বলল,—নইলে কি?

এই রে! নইলে যে কি সেটা তো ভেবে রাখা হয়নি। বৌয়ের কথায় থতোমতো খেয়ে উমাচরণ আকাশ-পাতাল ভাবতে বসল—নইলে কি? শেষ পর্যন্ত অনেক ঘেমে নেয়ে উত্তর করল,—নইলে আমি ঠাণ্ডা জলে চান করব।

নতুন বৌয়ের চটজলদি জবাব,—তাই কোরো।

এ কথার যে কী জবাব হবে উমাচরণের বন্ধুরা তাকে শিখিয়ে দেয়নি। বেচারা চুপ করে রইল।

এ পক্ষ চুপ করলে কি হবে, ও পক্ষ এবারে বান ডাকল। ফুলশয্যার রাতে ঘরের বাইরে সম্ভাব্য আড়ি পাতা জা'দের কান বাঁচিয়ে যতটা ডেসিবেল তোলা যায় ঠিক ততটা ডেসিবেলেই নতুন বৌ বলল,—বলতে লজ্জা করে না! নতুন বৌ সকালে উঠে তোমার জন্যে জল গরম করবে! ভেবেছটা কি?

আর 'ভেবেছ'! উমাচরণের মাথার সব ভাবনা-চিন্তা তখন ভেপার।

উমাচরণ জানত না প্রথম রাতে বেড়াল মারাটা তার একারই 'বিশেষ স্বাধিকার' কিংবা মৌরসিপাট্টা নয়। ওটা ও পক্ষও করতে পারে। তার বন্ধুরা তাকে প্রথম রাতেই বেড়াল মারতে শিখিয়ে দিয়েছে। নতুন বৌয়ের বান্ধবীদেরও পিছিয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। তারাও তাদের বান্ধবীকে বেড়াল মারতে কিংবা মারা রুখে দিতে শিখিয়ে দিয়েছে।

পরদিন উমাচরণ তার বন্ধুদের কাছে বিশেষ বিশেষ কিছু অংশ বাদ দিয়ে ফুলশয্যার বাকি অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করল। শেষে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ভাইরে, প্রথম রাতে বেড়াল মারার প্ল্যানটা পুরো ফ্লপ। এখন কী উপায় বল।

—আর উপায়! বিসমিল্লাতেই তো গলদ করে বসে আছিস।

—কিরকম?

—তোর নাম উমাচরণ। দেখেশুনে যাকে বিয়ে করলি তার নাম উমাশশী। এখন করে যাও সারাজীবন ধরে বউয়ের চরণ-সেবা।

উমাচরণের বিয়ে হয়ে গেল দশ বছর। এখন সকালে উঠে এক কাপ চা পেতে হলে উমাচরণ অনুনয় করে বলে,—দেবে না এক কাপ চা? এক বালতি গরম জল নয়, মাত্রই এক কাপ গরম চা!

এস এম এস সমাচার

পুলিশ এক মাতালকে রাস্তায় ধরেছে মাঝরাত্তিরে।

পুলিশ অ্যাই, কোথায় যাচ্ছিস?

মাতাল লেকচার শুনতে।

পুলিশ কিসের লেকচার?

মাতাল মদ খাওয়া যে ক্ষতিকর, সেই বিষয়ে লেকচার।

পুলিশ এত রাত্তিরে কে লেকচার দেবে?

মাতাল আমার বৌ।

❋ ❋ ❋

মাইকে ট্রেন আসার ঘোষণা হতেই সর্দারজি প্ল্যাটফর্ম থেকে রেললাইনে লাফ দিল। এক যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করল,—আরে, ট্রেনে কাটা পড়বে যে!

সর্দারজি বলল,—আরে কাটা পড়বি তো তুই। কেন, ঘোষণা শুনিসনি, ট্রেন এই প্ল্যাটফর্মে আসছে!!

—সৌমেন মিত্র

আই অ্যাম এ ডক্টর

প্রণব হোড়

অঙ্কন লেখক

রজনীগন্ধার মশারির ভেতর শুয়ে স্বপ্নটা দেখলুম—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনের উদ্যানে ঘাসের ওপর আমি আধশোয়া হয়ে বসে রয়েছি। চন্দ্রিমা একটু দূরে বসে দূর্বাঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে আমাকে প্রশ্ন করছে,—তোমার জীবনে সবচেয়ে কাছের মানুষ কে?

বললাম,—তুমি।

চন্দ্রিমা ডগোমগো হয়ে বলল,—আর তোমার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান প্রাপ্তি কি?

বললাম,—তুমি-ই।

ওমা! কোথায় চন্দ্রিমা? আমি দেখি মধুরিমার কোলে মাথা রেখে বালীগঞ্জ লেকে শুয়ে রয়েছি। মধুরিমা প্রশ্ন করল,—তুমি জীবনে সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসো?

বললাম,—তোমাকে।

মধুরিমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,—তুমি কাকে কাছে পেলে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যাও?

বললাম,—তোমাকেই।

মধুরিমা সর্বশেষ প্রশ্ন করল,—তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও?

বললাম,—সেও তোমাকে!

ফুস্। আবার ভোজবাজি। আমি বাসন্তীর কাঁধে মুখ রেখে গঙ্গাবক্ষে নৌকাতে ভাসছি। বাসন্তী আমার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে প্রশ্ন করল,—তুমি কার জন্যে মরতে ভয় পাও না?

বললাম,—তোমার জন্যে।

বাসন্তী নিশ্চিত হয়ে বলল,—কার জন্যে তুমি এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুখ পাও?

বললাম,—তোমার জন্যেই।

বাসন্তী আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল,—আর কার জন্যে তুমি তোমার জন্ম সার্থক মনে করো?

বললাম,—সেও তোমার জন্যেই।

ফুটুস্! তারপরেই ঘুম ভাঙল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। বুকের ভেতর ধুক্‌পুক্ করছে। এমনই স্বপ্ন দেখলাম যেন মনে হচ্ছে চন্দ্রিমা, মধুরিমা ও বাসন্তী জ্যান্ত জ্যান্ত আমার শয্যাগৃহে ঢুকে পড়েছে। ছিঃ ছিঃ! ভারি লজ্জা পেলাম। আমার ডানদিকে নবপরিণীতা স্ত্রী সৌদামিনী শুয়ে রয়েছে। চন্দন লেপ্টানো মুখ কিঞ্চিৎ হাঁ করে। নাকে মৃদু নাসিকাধ্বনি। মাথা থেকে ঘোমটা নির্বাসিত। পরম নিশ্চিন্তে বামহাতখানি মাথার তলায় রেখে 'দ'-র ভঙ্গিমায় স্বামীর সঙ্গে প্রথম রাত্রি যাপন করছে।

নিজেকে খুব ছোট মনে হল। এমন শুভরাত্রে এমন অশুভ স্বপ্ন কেউ দ্যাখে? অপরাধী অপরাধী ঠেকল নিজেকে। পালঙ্কের চারধারে রজনীগন্ধার মালা ঝুলছে। গন্ধে ম ম।

কিন্তু স্বপ্নটা দেখার পরই কেমন সব মোহ কেটে গেল। শুরু থেকেই মনের ভেতর খচ্ খচ্ করছিল। শয্যাগৃহের দরজা বন্ধ করবার পর টানা এক ঘণ্টা বসে বসে ট্রিপল্ ফাইভ ফুঁকেছি। আর এই কথা বলব সেই কথা বলব ভেবেছি। কিন্তু কি করব, আমার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। বুকের ভেতর চন্দ্রিমা, মধুরিমা, বাসন্তী সবাই যেন বসে বসে আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে, টিটকিরি দিচ্ছে। সৌদামিনী অবনত মুখে বিছানায় বসে অনেকক্ষণ বোধহয় আমার প্রতীক্ষা করল। শেষে কোনো রিপ্লাই না পেয়ে বিছানায় নিজেকে সাপ্লাই করে দিল।

ভারি ক্লান্ত ছিল কিনা সে। তখনই আমি মনের সব চিন্তা ঝেড়ে মুছে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা সোনার আংটি বের করে বৌয়ের কাছে গিয়ে বসলাম ও বললাম,—ওগো শুনছ, আজ প্রথম রাত্রে তোমাকে আমার ছোট্ট উপহার দিতে চাই।

সৌদামিনী আমার দিকে বাঁহাত বাড়াল। কালো তেল-চক্‌চকে হাতে একগাদা স্নো-পাউডার লাগিয়ে সাদা-সাদা ভাব করা হয়েছে। ফর্সা হয়েছে আর কি! কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সস্তা নয়। বালীগঞ্জের ছেলে আমি। জহুরীর চোখ। জন্ম থেকে রাশি রাশি সুন্দরী মহিলা গড়িয়াহাট থেকে গোলপার্ক পর্যন্ত দেখে চলেছি। দশ মাইল দূর থেকে যে কোনো মহিলার গায়ের রং দেখে বলে দিতে পারি তা কৃত্রিম না অকৃত্রিম। সেই আমাকে টুপি পরাচ্ছে? হাসি পেল। তাচ্ছিল্যের হাসি। কিন্তু সে হাসি হাসলুম না। বরং হেঁ হেঁ করে একটু রোমান্টিক হাসি হেসে বৌয়ের হাতে আংটি পরিয়ে দিলাম। আমার মুখের দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল সৌদামিনী। বললুম,—আমাকে কেমন লাগছে?

সে মুচকি হাসি হাসল। বলল,—আপনাকে কোনোদিন পাব আমি ভাবতেই পারিনি।

আহা! আদিখ্যেতা! আমাকে আবার 'আপনি' বলা হচ্ছে! আবার কথা কি—আমাকে কোনোদিন পাবে তা ভাবতেই পারেনি! কি করে ভাববে? গেঁয়ো ভূত হয়ে কলকাতার ডাক্তার ছেলেকে পাত্র পাওয়া চাট্টিখানি কথা নাকি? কিন্তু মনের কথা ব্যক্ত না করে আমি মিহি কণ্ঠে বললাম,—তোমাকে পাব আমিও কোনোদিন আশা করতে পারিনি।

সত্যিই তো! আমি কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলুম তিন তিনজন ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেও তাদের একটাকেও বিয়ে করব না? কারণ তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই। তাদের বাবাগুলো এক একটা ফতুর আদমি এবং চতুর আদমি। মেয়ে কোনো ছেলের গলা ধরে ঝুলে পড়ে বিনি পয়সায় বিদায় নিলে তাঁরা গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফেরেন। তাই তো আমি বিয়ে করলুম সৌদামিনীকে। অনেক দেখে-টেখে দরদাম করে লক্ষ্মী আনলাম ঘরে।

সৌদামিনী বললে,—আমার ভারি ঘুম পেয়েছে।

ও শুয়ে পড়ল। সাত্ পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমিও পাশে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়লাম এবং চোখ বুঁজলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্বপ্ন দেখলাম। সেই নিদারুণ অতীত প্রেমের দিনগুলি। তিন নায়িকা, নায়ক আমি। হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি কলকাতার মাঠে-ময়দানে গঙ্গাবক্ষে। স্বপ্ন ভাঙলে দেখি গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে। দু'গ্লাস জল খেলাম। ঘুম আর আসবে বলে মনেও হয় না। একটা সিগারেট ধরালাম। দোতলার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্ধকার মহানগরী অবলোকন করতে করতে নিজের বিবেক-বুদ্ধি লোভ স্বার্থপরতার প্রবৃত্তিগুলোকে অ্যানালিসিস করতে বসলাম।

ফ্ল্যাশ ব্যাক

চার বছর হল আমি ডাক্তারি পাশ করে কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে কাজ করি। কাজ করি বলতে ডাক্তারি করি। রোগী যখন তোষকহীন বেডে কি বেডের অভাবে হাসপাতালের বারান্দায়, সিঁড়িতে, বাথরুমের মেঝেতে, চট পেতে শুয়ে মরণ যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চিৎকার করে তখন আমি নার্সদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করি।

হাসপাতালের বেডের নিচে দিনরাত কুকুর বেড়াল শুয়ে থাকে। রাত দুপুরে পদ্মিনী নামে এক নার্স রোগীদের ওপর দরদে উথলে পড়ে বেডগুলোর কাছে ঘুর ঘুর করতে করতে কোনো পাগলা কুত্তার পা দিয়েছে মাড়িয়ে। খ্যাঁক্ করে তাকে কামড় দিয়েছে কুত্তা। এক্কেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। সে এক কেলো। পদ্মিনীকে চ্যাংদোলা করে আমি ছুটলাম বেসরকারি হাসপাতালে। আমাদের হাসপাতালের ওষুধ পদ্মিনীকে দেওয়ার সাহস পেলাম না। এ হাসপাতালের কোনটা যে জাল আর কোনটা যে আসল ওষুধ তা আমরা নিজেরাও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটা কথা। নার্সদের সঙ্গে আমি ঠাট্টা-ফাজলামো করি বটে, তবে তাদের সকলের সঙ্গে ঠিক সেই অর্থে পেয়ার-মহব্বত করি না।

চন্দ্রিমা, মধুরিমা ও বাসন্তী তো আমার জন্যে খেলছেই। আমিই খেলাচ্ছি। ছিপ নিয়ে বসে নিপুণ কৌশলে একসঙ্গে নাচাচ্ছি তিনজনকে। তিনজনে সমান সুন্দরী। সমান অহঙ্কারী। সমান হিংসুটে। আলাদা আলাদা ভাবে ওদের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরতে আমার বেশ লাগে। আলাদা আলাদা ভাবে ওদের তিনজনকে আমি কথাও দিয়েছি—ওগো, তোমাকেই আমি বিয়ে করব।

তা সে 'কথা' তো কত পেশেন্টেকেও দিই। যেমন—আপনাকে আমি বাঁচাবই। কিন্তু বাঁচাতে পারি কি ছাই! হয়ত চেষ্টা-চরিত্তির করে বাঁচানো যায়। তবে তাতে আমার লাভটা কি! সরকারি হাসপাতাল। মাস মাইনে বরাদ্দ। রোগী মরলেও যে মাইনে, বাঁচলেও সেই মাইনে। কথা দিলেই যে কথা রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাই চন্দ্রিমা, মধুরিমা ও বাসন্তীকে কথা দেওয়া সত্বেও যখন বাড়ি থেকে আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে বাবা-মা-দাদা-বৌদিরা তৎপর হলেন, আমি কিচ্ছুটি বাধা দিলাম না। ভাবলাম আরো মেয়ে দেখা হচ্ছে হোক না। সুন্দরী থেকে সুন্দরীতর মেয়েরাও তো আছে। ডানাকাটা ফাইন পরী যাকে বলে। সেইসঙ্গে যদি একটি পয়সাওয়ালা শ্বশুর জোটে তো দারুণ দাঁড়াবে ব্যাপারটা।

দু-দু'খানা খবরের কাগজে রোববারের পাতায় 'পাত্রী চাই' কলমে বিজ্ঞাপন বের হল—সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন ডাক্তার, বয়স ৩০, উচ্চতা-৫ ফুট ৯ ইঞ্চি, মাসিক আয় ৮০ হাজার। প্রকৃত সুন্দরী কায়স্থ পাত্রী চাই।

সামান্য ক'টা শব্দের কি অসম্ভব জোর। অ্যাটম বোমার শব্দের চাইতেও বেশি। বক্স নম্বরে ঠিকানা। মাত্র একমাসের মধ্যে ন'শ ছিয়ানব্বইটি চিঠি এল। রাশি রাশি চিঠি। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড, লেফাফা ঘরের চারধারে ছড়াছড়ি। বাবা পড়েন, দাদা পড়েন। মা দ্যাখেন, বৌদি হাসেন। ভাইপো বাতিল চিঠি নিয়ে নৌকো বানিয়ে বাথরুমের চৌবাচ্চায় ভাসায়। স্নান করতে গিয়ে দেখি নৌকো ভাসছে। তাতে কোনো এক বৃদ্ধ কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষরে ডটপেনে চিঠি লিখেছেন—মাননীয় মহাশয়, কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপন অবগত হইলাম। আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা স্বর্ণলতার বিবাহের জন্য....ইত্যাদি ইত্যাদি। আইবুড়ো মেয়ের বৃদ্ধ বাপ অকূল দরিয়ায় ভাসছেন, এমনকি তাঁর চিঠিটাও বাথরুমের চৌবাচ্চায় ভাসছে। তবে আমি বেশিক্ষণ তা ভাসতে দিলাম না। জানালা দিয়ে পেছনের নর্দমায় কুণ্ডুলী পাকিয়ে ফেলে দিলাম।

কয়েকদিন পর প্রতি রোববার বাবা ,মা ও দাদাকে বিভিন্ন মেয়ের বাড়ি ছুটতে দেখলাম। একসঙ্গেই ঘর থেকে বের হই। আমি যাই চন্দ্রিমা কি মধুরিমার বাড়ি আর ওঁরা যান বৌমার বাড়ি। মানে বৌমার খোঁজে। পঞ্চাশ-ষাটটি মেয়ে দেখে একটিও মনঃপূত হল না। শেষে সন্ধান মিলল সৌদামিনীর। নিত্যপদর কন্যা সৌদামিনী। হুগলীতে বাড়ি। ভদ্রলোকের বিরাট অবস্থা। আলুর দুটো কোল্ড স্টোর। বলা বাহুল্য তাতে ব্যবসা জমজমাটি। বংশধর বলতে মাত্র দুটি মেয়ে। বড় মেয়ে পাগলিনী। খালি হাসে। মানসিক ভারসাম্যহীন। ছোটবেলা থেকেই হাসত। তাই তার নাম আমোদিনী দেওয়া হয়েছিল। বড় হলে দেখা গেল তখনো সে হেসে চলছে। হেসে গড়াগাড়ি খেয়ে চলেছে। বোঝা গেল এত হাসির কারণ। আমোদিনী পুরোপুরি উন্মাদিনী। শেষে ছোট মেয়ে সৌদামিনী বংশের মুখ রক্ষা করেছে। সুস্থ, সুন্দরী, টাটকা যুবতী। বাইশ বছর বয়েসে প্রাইভেটে মাধ্যমিক পাশ করে অধুনা ঘরে বসে রয়েছে। নিটোল মুখ, গাত্রবর্ণ কালো। বাপের এককাঁড়ি টাকা। এখন তার বিবাহ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। উপযুক্ত জামাতা চান. সৌদামিনীর

আলুওয়ালা বাপ নিত্যপদ ঘড়ুই।

হিসেব কষলাম। সৌদামিনীকে বিয়ে করলে আমার কি কি লাভ হবে। উত্তরে দেখলাম কী না লাভ হবে! মেয়েটা গেঁয়ো বটে, কালো বটে, কিন্তু তাতে কি? ঐ বাড়ির জামাই হলে যে কুবেরের ধন হাতের মুঠোয় আসবে, সে কথা ভুললে চলবে? কভি নেহি। অতএব মেয়ের বাপের হাতে ধরা দিলাম। ভাবী শ্বশুর বললেন,—বুঝলে বাবাজীবন, তোমাকে আমি দক্ষিণ কলকাতাতেই নার্সিংহোম খুলে দেব। শুনেছি তাতে নাকি অধিক পয়সা।

ইয়াল্লা! এ যে মেঘ না চাইতে জল। বিনয়ে গদ গদ হলাম।

ধুমধাম করে সৌদামিনীকে বিয়ে করে ফেললাম। বিয়ের আগে তিন প্রেমিকাকে আলাদা আলাদা ভাবে বলে দিলাম। অনিবার্য কারণবশত আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারছি না। দুঃখিত, মাফ করে দিও। যেন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে দুঃখিত হয়েছি এবং ক্ষমা চাইছি। চন্দ্রিমা শুনে কাঁদল। মধুরিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাসন্তী আমাকে এক চড় মারল।

সুইট হোম ও নার্সিং হোম

নার্সিংহোমের নাম দিলাম সানরাইজ নার্সিংহোম। শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মহাশয় অঢেল অর্থ ব্যয় করে গড়িয়াহাটের মতো জায়গায় নার্সিংহোমটি আমাকে গড়ে দিলেন। শুরুতেই দশটি বেড রাখলাম নার্সিংহোমে। সরকারি হাসপাতালের ফাল্‌তু চাকরিটি ছেড়ে দিলাম। আমি এখন ব্যবসায়ী ডাক্তার হব, চাকুরিজীবী ডাক্তার নয়।

ছ'মাস যেতে না যেতেই ফুলে উঠল ব্যবসা। রম্‌রম্‌ করে উঠল নার্সিংহোম। প্রতিদিন তিন থেকে চারজন নবজাতক জন্ম নিতে লাগল 'সানরাইজে'। অসংখ্য সান রাইজ হতে লাগল আর কি! সবই সিজারিয়ান ডেলিভারি। অপারেশন-কাটা-ছেঁড়া-ব্লাড-স্যালাইন—গেল গেল রব। সব মিলিয়ে যত নাটকীয়তা জমে ওঠে ততই পয়সার ঝমাঝম্‌ শব্দ।

লাভটা আরো বাড়ে অ্যাবরশনের ক্ষেত্রে। বেআইনি বাচ্চা দুনিয়া থেকে হঠাও। টপ্‌ সিক্রেট কেস। যত টাকা লাগে পরোয়া নেই। আমরা ডাক্তাররা সেজন্যেই তো আছি। সানরাইজে গোপনে সানসেটেরও ব্যবস্থা করে দিই।

ব্যবসা স্ফীত হয়ে উঠতে না উঠতেই আমার বৌ মা হতে চলল। আমি ড্যাডি হতে চললুম। আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলাম। শেষকালে হল সন্তান। পুত্রসন্তান। কিন্তু নর্মাল নয়, সিজারিয়ানই হল।

ছেলের নাম রাখলাম দিব্যজ্যোতি। এই নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে একটু মতবিরোধ ঘটল। তিনি চেয়েছিলেন ছেলের নাম রাখবেন শ্যামাপদ। নিত্যপদ নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

ছেলের সাধ নাতিতে পূরণ করবেন আর কি! অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো।

আমি রাজি হলাম না। ইয়ার্কি নাকি! শ্যামাপদ একটা নাম হল! মডার্ন নাম হওয়া চাই। ওসব পদ-ফদ ব্যাকডেটেড্‌। শ্বশুরমশাই শুনতে রাজি নন। সৌদামিনীও আমাকে আড়ালে চোখ পাকিয়ে বলল,—বাবার কথার অবাধ্য হতে তোমার লজ্জা করে না? ছিঃ! আমি বলছি ছেলের নাম শ্যামাপদ রাখব। দিব্যজ্যোতি নয়।

আমি বললাম,—কভি নেহি। ছেলে আমার। আমার নাম বিকাশজ্যোতি। ছেলের নাম দিব্যজ্যোতি। ছেলের নাম দিব্যজ্যোতিই রাখব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বংশ তো নয়, যেন জ্যোতিপুঞ্জ!—বৌ টিপ্পনী কাটে।

শেষে মুখেভাতের দিন ঠিক হল লটারি করে ছেলের নামকরণ করা হবে। ঘরের দু'প্রান্তে দু'টি বাটি থাকবে। দু'টি বাটিতে দু'টি কাগজে দু'টি নাম থাকবে। একটিতে শ্যামাপদ অপরটিতে দিব্যজ্যোতি। আমার ছেলেকে দু'টি বাটির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। সে যে বাটিটা গিয়ে ধরবে তাই হবে তার 'নামকরণ'। বুদ্ধিটা শ্বশুরমশাই-এর। অনিচ্ছা সত্বেও অবাধ্য হতে পারলাম না।

কপাল ঠুকে নেমে পড়লাম ভাগ্য নির্ধারণে। দু'টি কাগজ নিয়ে একটিতে পরিষ্কার করে লিখলাম—শ্যামাপদ, অন্যটিতে দিব্যজ্যোতি। বৌ দু'টি পেতলের বাটি নিয়ে এল। কাগজ দু'খানি নিপাট ভাঁজ করে বাটি দু'টর মধ্যে রাখলাম। আমি দিব্যজ্যোতি বাটিটি বাম প্রান্তে রাখলাম। আমি বামপন্থী। বামে আমি ছেলেকেও টানতে চাই। এখন দেখা যাক। ফুলের মালা, মুকুট পরিয়ে আমার নামহীন পুত্রকে ঘরে এনে ছেড়ে দেওয়া হল। যেন অ্যাম্ফি থিয়েটারে গ্রীক গ্লাডিয়েটর প্রবেশ করল। হৈ হৈ পড়ে গেল ঘরের ভেতর। মুহূর্তের ভেতর সবাই সাইড্‌ খুঁজে নিলাম। দিব্যজ্যোতি বাটির পাশে আমি আমার দাদা, বৌদি ও ভাইপোকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শ্যামাপদ বাটির পাশে শ্বশুরমশাই, শাশুড়িমাতা, সৌদামিনী ও আমোদিনী দাঁড়িয়ে পড়ল। খিল্‌ খিল্‌ করে ফোক্‌লা মুখে আমার ছেলে হাসল। আমরা তারস্বরে চিৎকার করলাম,—ওয়ান-টু-থ্রী—স্টার্ট!

প্রথমে তো ছেলে কোনোদিকেই এগোয় না। আমি হাততালি দিয়ে ডাকলাম,—এদিকে সোনা, এ বাটিটা ধরো সোনা।

আমার শোনাশুনি নিত্যপদ গ্রুপ সদলবলে হাততালি দিয়ে ডবল চিৎকার জুড়ল,—এদিকে সোনা, এ বাটিটা ধরো সোনা। আসো আসো।

আমরাও হারবার পাত্র নই। গলা আরো ওপরে তুললাম। শ্বশুর আরো ওপরে তুললেন। ঘরে মধ্যে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। ছেলে একবার মাতৃকুলের দিকে হামাগুড়ি দেয়, আবার আমার গলা বাড়লে পিতৃকুলের দিকে হামাগুড়ি দেয়। হেঁইয়ো-হেঁইয়ো রব। যেন রেসের মাঠে ঘোড়া ছোটাচ্ছি। আমোদিনী আহ্লাদে আটখানা হয়ে হঠাৎ হাসতে শুরু করল। মহা আমোদ পেয়েছে সে। হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ কী বিকট সে হাসি। সেই হাসিতে ভয় পেয়ে হোক কি আমার ভাগ্যগুণে হোক—আমার পুত্র পিতৃকুলের দিকে ছুটে এসে আমাদের বাটিটি ধরল। আমি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম,—আমি জিতেছি! আমি জিতেছি!

শ্বশুরমশাই ভীষণ অপমান বোধ করলেন। সেদিনই দেশে ফিরে গেলেন। এক বছর আমার সঙ্গে কথা কইলেন না। এ বাড়িতেও এলেন না।

মাই সন্‌ ও তার এডুকেশন

দিব্যজ্যোতি বড় হল। তিন বছরে পা দিল। নার্সিংহোম চালানোর পাশাপাশি ছেলের শিক্ষাদীক্ষার দিকেও নজর দিলাম আমি। ওকে আমি অনেক বড়—অনেক বড় ডাক্তার করতে চাই। বাপ কা বেটা, বাপের ব্যবসাতেই আসুক। সুন্দরী এক দিদিমণি রাখলাম ছেলের জন্যে। তিনি রোজ বিকেলে এসে ঘণ্টা দুয়েক ছেলেকে ইংরেজি শেখান। চমৎকার ইংরেজি শেখে আমার ছেলে। আমি ঠিক করেছি আসছে বছর সাউথ ক্যালকাটার সব চাইতে বড় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করাব। দিদিমণিও বলেছেন তিনি গ্যারান্টী দিচ্ছেন।

অনেকেই শেখান, কিন্তু যত্ন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সবাই শেখান না।
২৫৩০-৩২০৩ আমরা সেই চেষ্টাই করি। ৯৮৩১১-৮৯৫৭০
শিল্প শিক্ষায়তন
১০/এ, রাম পাল লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫
(বি. কে. পাল পার্কের কাছে)
মনোহরণ সুগন্ধী প্রস্তুত প্রণালী
হার্বাল বিউটিশান কোর্স
শৌখীন গহনা নির্মাণ
সেলাই
চকোলেট তৈরি করা
এমব্রয়ডারি
বাটিক
রকমারি ব্যাগ বানানো
ফেব্রিক
বাঁধনি
ব্লক ছাপাই
নরম-কোমল খেলনা তৈরি
কাচের ওপর খোদাই ও রঙের কাজ

বড় স্কুলের বড় ব্যাপার। নার্সারিতে ছেলেমেয়ে ভর্তি হবে, তার জন্যে ছ'মাস আগে থাকতে ফর্ম দেওয়া হবে। সীমিত সংখ্যক ফর্ম। আগে আসার ভিত্তিতে দেওয়া হবে। স্কুলের অফিস কাউন্টারে সুদীর্ঘ লাইন। অসহায় পিতা-মাতার দল লাইন দিয়েছেন। আমি নার্সিংহোমের দারোয়ান নরসিংহকে পাঠালাম ফর্ম আনবার জন্যে। বেচারা সে নার্সিংহোমের দারোয়ান হয়ে স্কুলের দারোয়ানের কাছে ডান্ডা খেয়ে ফিরে এল। গার্জিয়ানকে লাইনে দাঁড়াতে হবে। চাকর-বাকর পাঠানো চলবে না। শেষে নিজে গিয়ে ধস্তাধস্তি করে গলদঘর্ম হয়ে একটা ফর্ম নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ফর্ম ফিল-আপ করে যথারীতি নির্ধারিত সময়ের ভেতর জমাও করে দিলাম।

ছ'মাস পরে ছেলের অ্যাডমিশন টেস্ট হল। হাজার খানেক বাচ্চা পরীক্ষা দিল। শুনলাম সিট মাত্র দেড়শ। জোরদার কম্পিটিশন। লিখিত ও মৌখিক দুটো পরীক্ষা হল। স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক নির্বাচনে হাজারের মধ্যে দু'শ বাচ্চাকে নির্বাচন করলেন। তার মধ্যে আমার পুত্র দিব্যজ্যোতির নাম রয়েছে।

এবার হবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্বাচন। নির্বাচিত বাচ্চাদের বাপ-মা'কে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। মুখে মুখে ইংরেজিতে বাপ-মা'কে কিছু প্রশ্ন করা হবে। তার উত্তর দিতে হবে। তারই ভিত্তিতে দেড়শটি বাচ্চা টিকে থাকবে। বাচ্চাদের বাপেরা প্রায় রেলে কাটা পড়বে তাতে। আমার কি হবে কে জানে?

সৌদামিনী ঘাবড়ে গেল। বলল,—ওগো, সেকি গো! আমি যে ঠিকমতো ইংরেজি বলতে পারি না।

আমি বোঝালাম,—চেষ্টা করবে। পাশে তো আমি থাকবই। ভয়ের কিছু নেই। আমিই চালিয়ে নেব।

সেকেন্ড রাউন্ডের দিন গার্জিয়ানরা হাজির হলাম স্কুলে। দু'শটি বাচ্চার চারশটি বাপ-মা এসেছে। গিজ্ গিজ্ করছে ভীড়ে। বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। তার মধ্যে কয়েকজন চেনা-জানা মহিলার মুখ বেরিয়ে পড়ল। আমার সানরাইজে তাঁরা মা হতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমায় কথা বলতে দেখে সৌদামিনী রাগ করল। আড়ালে বলল,—তুমি মেয়েছেলে দেখলে বড্ড ল্যা-ল্যা করো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ফাইনাল খেলা। হেড-মিস্ট্রেসের ঘর থেকে একে একে ডাক পড়তে লাগল গার্জিয়ানদের। মুখ শুকনো দম্পতিদের। ঝাড়া তিন ঘন্টা আমি ও সৌদামিনী তীর্থের কাকের মতো বাইরে অপেক্ষা করলাম। শেষে ডাক এল।

সৌদামিনীকে নিয়ে আমি হেড মিস্ট্রেসের ঘরে ঢুকলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখলাম পাঁচজন টিচার বসে রয়েছেন। মধ্যমণি হেড দিদিমণিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ যে বাসন্তী! বাসন্তী কিন্তু আমাকে দেখেও দেখল না। তবে চিনতে পারল। শুধু বলল,—প্লিজ সিট ডাউন।

আমরা স্বামী-স্ত্রীতে চেয়ারে বসলাম।

বাসন্তী শুধাল,—নেম প্লিজ?

বাসন্তী আমার নাম জানে। আমাকে আগে ও আদর করে 'বিকু' বলে ডাকত। মনটা খুব খারাপ লাগল। শুকনো মুখে বললাম,—মাই নেম ইজ ডাঃ বিকাশজ্যোতি মল্লিক।

আমার বৌকে প্রশ্ন ছুঁড়ল,—ইওর নেম?

—সৌদামিনী।—সৌদামিনী উত্তর ছুঁড়ল।

কেমন করে বাসন্তী যেন সৌদামিনীর দিকে চাইল। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করলাম।

—আর ইউ হাউস-ওয়াইফ?—বাসন্তীর দ্বিতীয় প্রশ্ন।

—নো। আমি বিকাশজ্যোতির ওয়াইফ।—অত্যন্ত সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে উত্তর দিল আমার বৌ।

বাসন্তী ঠোঁট বাঁকাল। (অতীতে যে ঠোঁটে আমি চুমু খেতাম)। বোর্ডের অন্যান্য শিক্ষিকামণ্ডলীও ঈষৎ হাসলেন। আমি ছাই দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলাম,—একচুয়ালি মাই ওয়াইফ ইজ ইন টেনশন ফর মাই সন। উই আর ভেরি ইন্টারেস্টেড ফর দিস স্কুল। ইফ মাই সন গেট এ চান্স ওভার হেয়ার, উই উইল বি হ্যাপি...একচুয়ালি দিস্ স্কুল...

বাসন্তী আবার কেমন করে তাকাল আমার দিকে। ভয় পেয়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাসন্তী বলল,—হ্যাড ইউ ফিনিশড্ ইওর অ্যানসার?

এবার বাসন্তীর গলা শুনে আরো ঘাবড়ে বললাম,—ইয়েস বাসন্তী। স্যরি, ইয়েস ম্যাডাম।

সেদিন বাড়ি ফেরবার পর সৌদামিনী খুব কাঁদল। ছেলের ভর্তি না হওয়ার জন্যে নয়। আমার ঐ নাম ধরে ডাকার জন্যে। শ্বশুরবাড়ির সকলকে ও আবার ট্যাঁড়া পিটিয়ে বললও সে কথা। সবাই তারিফ করল আমার।

আমি রাগে দুঃখে নার্সিংহোম গেলাম না। হোম, সুইট হোম—সেখানেই যদি অশান্তি, নার্সিংহোম গিয়ে কি আর শান্তি পাব?

ছেলেকে ভর্তি করালাম পাড়ার স্কুলে। পরের বছর মোটা টাকা ডোনেশন দিয়ে সব থেকে বড় মিশনারি স্কুলে ভর্তি করব ছেলেকে। সেটাই ঠিক করলাম। আর সেইজন্যে আমার ভিজিট দিলাম বাড়িয়ে। তিনশ থেকে আপাতত পাঁচশ টাকা।

লক্ষ্মী আসুক ঘরে!!

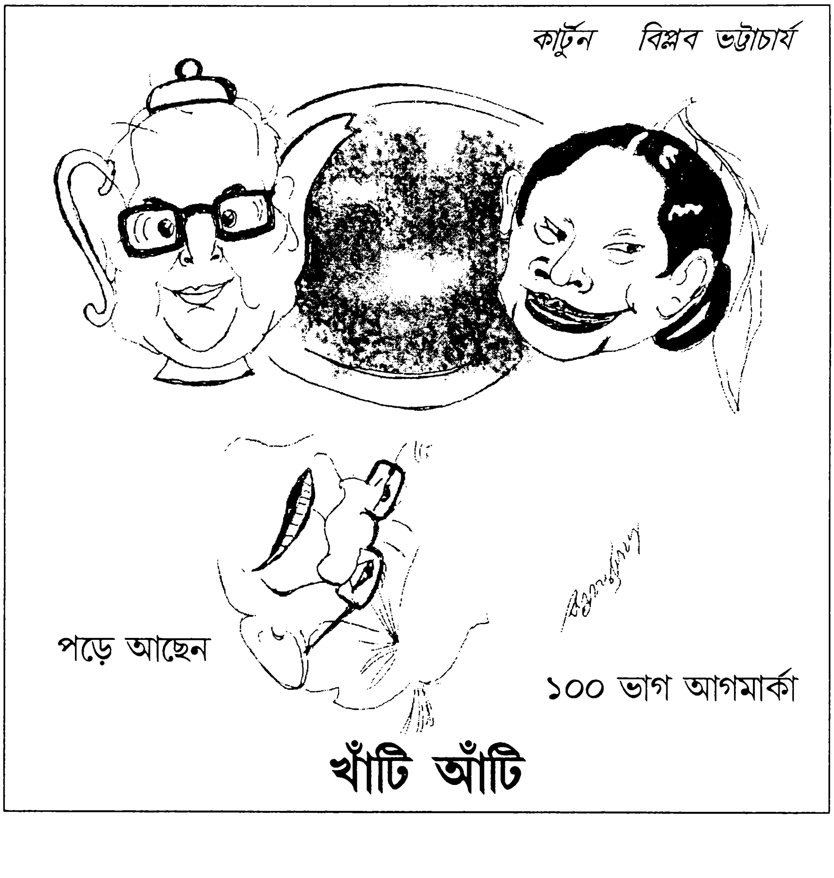

বিদ্রূপ রচনা

আছোলা বাঁশ

দেবু ঘরামি

মাইরি বলছি, আমি রাজনীতি করি না। রাজনীতির আলোচনা হলে রা কাড়ি না আমি। যেটা করি সেটা হল আজনীতি। এই নীতিটাই মেরেলেদের মধ্যে জনপ্রিয়। আজ যে নীতি নিয়ে তারা চলে, কাল সে নীতি পাল্টে যাবে। দেখেছি এইরকম নীতিবান মানুষগুলোই জনগণের পছন্দ।

সারা জীবন তোলাবাজি মাস্তানি করে যে লোকটা টু পাইস কামিয়ে নিয়েছে, সে ইলেকশনে জিতে এম. পি., এম. এল. এ. হচ্ছে। উদ্দেশ্য? দেশোদ্ধার, জনগণের কল্যাণ! পছন্দসই নেতা-নেত্রীদের পেছনে লাইন দিচ্ছে। এইসব ধান্দাবাজের নীতি বলতে কী হতে পারে? এদের নীতি একটাই—গিরগিটি হও, যেখানে আছ সেখানে পরিবেশের রঙের সঙ্গে মিশে যাও! আজ সবুজ তো কাল হলুদ, পরশু লাল।

এইসব আজনীতিবিদদের হাতে হাতে ঘোরে আছোলা বাঁশ। কে কখন কার পেছনে দেবে তা কেউ বলতে পারে না। এদের কাছে জনপ্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে ইলেকশনে জেতার পর লক্ষ্য একটাই থাকে—লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার। গিরগিটির গায়ের রং যাই হোক না কেন, নিরীহ জীব দেখলেই তার জিভ ছুটবে বিদ্যুৎগতিতে।

আমি ঘরামির পো, মেরেলেদের আজনীতির সঙ্গে আমার আজনীতির কোনো মিল নেই। পরের ঘর ছাওয়াতেই আমার আনন্দ। নিজেরটা ছাইবার সময় হয় না আমার। ✂

শেষপাত

আমু

ঠেলাগাড়ির চাকা আটকে! দে ঠেলে দে, চলুক!
আহ, দেশের সেবক ছেলে—সবাই দেখে বলুক!
এইরে, চাকা নড়ছে না তো!
একটুকুও নড়ছে না যে!
ওরে ভোঁদড়, করছিস কি, একি মগের মুলুক?

দিদিমণির খাসতালুকে তোর কি জনসেবার
ঝোঁক চেপেছে মাথার? পালা, নয়ত এসে এবার
পড়ার ক'টা লায়েক ছেলে সরিয়ে দেবে তোকেই ঠেলে
আটকে থাকা ঠেলার চাকা তুই কে নাড়া দেবার?

ওরা ঠেললে তলিয়ে যাবি, পাবি না আর থই
সেবা হয় না দিদিমণির পারমিশনটা বই। ✂

ধারাবাহিক কবিতা

মিলন খেলা

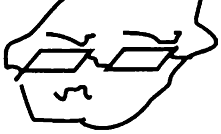

ভূতলেন্দু ভৌমিক

(পূর্ব প্রজ্জ্বলনের পর)

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
আমার জন্যে, আমারি জন্যে হয়েছ তুমি সৃষ্টি।
(চিতা বহ্নিমান)

পোস্ট পোস্ট মডার্ন কবিতা

ভাট্

মৈনাক মিত্র

ভাটপাড়া চলে যাও
দাগা দেওয়া প্রেমিকা তোমার
যেখানে বসতি করে;
গিয়ে তাকে সোজা বলো—
ভাট্!!

পাঁচন

পান্তুয়া ভাঁড়

অ্যান্টিম টার্ট আর নাক্স ভম
সঙ্গে দুফোঁটা নাইট্রিক
তার সাথে দিলে অশ্বগন্ধা—
তোমার কবিতা হ্যাট্রিক।

আঃ

হা-রে-রে-রে হাঘরে

মধ্য দুপুরে ঘোর রাত্রি নামে
অতএব আমার বোতল খুলে
বসা ছাড়া আর পথ নেই,
কালনেমির লঙ্কাভাগ আর
কতকাল চেয়ে চেয়ে দেখব?
মৌতাতের সময় বিরক্ত কোরো না
আঃ!! ✂

পুরনো কাসুন্দি

শিবরাম চক্রবর্তীর

"আমার ব্যাঘ্রপ্রাপ্তি"

অঙ্কন চন্দন মিশ্র

একবার আমাকে বাঘে পেয়েছিলো। বাগে পেয়েছিলো একেবারে। আমার কাহিনী আরম্ভ হয়।

এতক্ষণ আমাদের চার-ইয়ারি আড্ডায় আর সকলের শিকার-কাহিনী চলছিলো। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে যে যার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছিলেন। আমার পালা এলা অবশেষে।

অবশ্যি সবার আগে শুরু করেছিলেন এক ভালুক-মার। তাঁর গল্পটা ভারী রোমাঞ্চকর। ভালুকটা তাঁর বাঁ হাতখানা গালে পুরে চিবোচ্ছিল কিন্তু তিন তাতে একটুও না বিচলিত হয়ে এক ছুরির ঘায়ে ভালুকটাকে সাবাড় করলেন। ডান হাত দিয়ে—তাকে হাতিয়ে।

আমি আড় চোখে তাঁর বাঁ হাতের দিকে তাকালাম।সেটা যে কখনো কোন ভালুক মন দিয়ে মুখস্থ করেছিল তার কোনন চিহ্ন সেখানে নেই।

না থাক, আমা মনের বিস্ময় দমন করে আমি জিজ্ঞেস করি, 'ভালুক কি আপনার কানে কানে কিছু বলেছিলো?'

'না। ভালুক আবার কি বলবে।' তিনি অবাক হন।

'ওরা বলে কিনা, ওই ভালুকরা।' আমি বলি কানাকানি করা ওদের বদভ্যাস। পড়েননি কথামালায়?'

'মশাই এ আপনার কথামালার ভালুক নয়। আপনার ঈশপ কিংবা গাজার শপ পাননি।' তাঁর মুখে-চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে। 'আস্ত ভালুক। একেবারে জলজ্যান্ত।'

ভালুক শিকারীর পর শুরু করলেন এক কুর্মবীর। তাঁর কচ্ছপ ধরার কাহিনী। তাঁরটাও জলজ্যান্ত। জল থেকেই তিনি তুলেছিলেন কচ্ছপটাকে।

কচ্ছপটা জলের তলায় ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। হেদো-গোলদীঘির কোথাও হবে। আর উনি ডাইভ খাচ্ছিলেন—যেমন খায় লোকে। খেতে খেতে একবার হলো কি ওঁর মাথাটা কচ্ছপের পিঠে ঠক করে ঠুকে গেল। সেই ঠোক্কর না খেয়ে তিনি রেগেমেগে কচ্ছপটাকে টেনে তুললেন জলের থেকে।

'ইয়া প্রকাণ্ড এক বিশমণী কাছিম। বিশ্বাস করুন।' তিনি বললেন: 'একটুও গাঁজা নয়, নির্জলা সত্যি। জলের তলা থেকে আমার নিজের হাতে টেনে তোলা।'

'অবিশ্বাস করার কি আছে?' আমি বলি 'তবে নির্জলা সত্যি—এমন কথা বলবেন না।'

'কেন, বলবো না কেন?' তিনি ফোঁস করে উঠলেন।—'কেন শুনি?'

'আজ্ঞে, নির্জলা কি করে হয়? জল তো লেগেই ছিলো কচ্ছপটার গায়ে।' আমি সবিনয়ে জানাই।—'গা কিংবা খোল—যাই বলুন, সেই কচ্ছপের।' আমি আরো খোলসা করি।

তারপর আরম্ভ করলেন এক মৎস্য অবতার—তাঁর মাছ ধরার গল্প। মাছ ধরাটা শিকারের পর্যায়ে পড়ে না তা সত্যি, কিন্তু আমাদের আড্ডাটা পাঁচ জনের। আর, তিনিও তার একজন। তিনিই বা কেন বাদ যাবেন। কিন্তু মাছ বলে তাঁর কাহিনী কিছু ছোটখাট নয়। এইসা পেল্লায়

পেল্লায় সব মাছ তিনি ধরেছেন, সামান্য ছিপে আর নাম মাত্র পুকুরে—যা নাকি ধর্তব্যের বাইরে। তার কাছে তিমি মাছ কোথায় লাগে্।

'তুমি যে-তিমিরে তুমি সে-তিমিরে।' আমি বলি। আপন মনেই বলি—আপনাকেই। কি, তিনি তো মাছ ধরতে লাগলেন, আর ধরে খেতে লাগলেন—আকচার। কেবল তাঁর মাছের কাঁটাগুলো আমাদের গলায় খচখচ করতে লাগলো।

তাঁর Fish-ফিসিনি—ফিনিশ হলে, আমরা বাঁচলাম।

কিন্তু হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই শুরু হলো এক গণ্ডার বাজের। মারি তো গণ্ডার—কথায় বলে থাকে। তিনি এক গণ্ডার দিয়ে শুধু গণ্ডারটাকেই নয়, আমাদেরও মারলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরাও এক গণ্ডার কম ছিলাম না।

এক গণ্ডারের টেক্কায়—একটি ফুৎকারে আমাদের চার জনকেই যেন তিনি উড়িয়ে দিলেন। চার জনার পর আমার শিকারের পালা এলো।

নাচার হয়ে আরম্ভ করতে হলো আমায়।

'হ্যাঁ, শিকারের দুর্ঘটনা আমার জীবনেও যে না ঘটেছে তা নয়। আমাকেও একবার বাধ্য হয়ে......'

আমার শিকারোক্তি শুরু করি।

'মাছ না মাছি?' মৎস্য-কুশলী প্রশ্ন করেন।

আমি অস্বীকার করি—'মাছ? না, মাছ না। মাছিও নয়। মশা, মাছি, ছারপোকা, কেউ কখনো ধরতে পারে? ওরা নিজগুণে ধরা না দিলে?'

'তবে কি? কোন আর্সোলা-টার্সোলাই হবে বোধ হয়??'

'আর্সোলা? বাবা, আরশোলার কেই ধার-কাছে ঘ্যাঁষে?' বলতেই আমি ভয়ে কাঁপি।—'না আরশোলার ত্রিসীমানায় আমি নেই মশাই। তার ফর্‌ফর্‌ করলেই আমি সফরে বেরিয়ে পড়ি। দিল্লী কি আগ্রা অদ্দুরে যাই নে, যেতেও পারি নে, তবে হ্যাঁ, বালিগঞ্জ কি বেহালায় চলে যাই। তাদের বাড়াবাড়ি থামলে, ঠাণ্ডা হলে, বাড়ি ফিরি তারপর।'

'তা হলে আপনি কি শিকার করেছিলেন, শুনি? হাসতে থাকে সবাই।

'এমন কিচ্ছু না, একটা বাঘ।' আমি জানাই 'তাও সত্যি বলতে আমি তাকে বাগাতে যাই নি, চাইও নি। বাঘটাই আমাকে মানে, বাধ্য হয়েই আমাকে, মান কিনা, আমার দিকে একটুও ব্যগ্রতা না থাকলেও শুধু কেবল ও-তরফের ব্যাগ্রতার জন্যেই আমাকে ওর খপ্পরে পড়তে হয়েছিলো। এমন অবস্থায় পড়তে হলো আমায়, যে তখন আর তাকে স্বীকার না করে আমার উপায় নেই....'

আরম্ভ করি আমার বাঘাড়ম্বর।

'....তখন আমি এক খবর-কাগজের আপিসে কাজ করতাম। নিজস্ব সংবাদদাতার কাজ। কাজ এমন কিছু শক্ত না। সংবাদের বেশির ভাগই গাঁজায় দম দিয়ে মনশ্চক্ষে দেখে লেখা—এই যেমন, অমুক শহরে মাছবৃষ্টি হয়েছে, অমুক গ্রামে এক ক্ষুরওয়ালা চার-পেয়ে মানুষ জন্মেছে (স্বভাবতঃই নাপিত নয়), কোন গহন পাহাড়ে এক অতিকায় মানুষ দেখা গেল, মনে হয় মহাভারতের আমলের কেউ হবে, হিড়িম্বা-ঘটোৎকচ-বংশীয়। কিংবা একটা পাঁঠার পাঁচটা ঠ্যাং বেরিয়েছে অথবা গোরুর পেটে মানুষের বাচ্চা—মানুষের মধ্যে যেসব গোরু দেখা যায় তার প্রতিশোধ—স্পৃহাতেই হয়ত বা—দেখা দিয়েছে কোথাও! এই ধরণের যত মুখরোচক খবর। 'আমাদের ষ্টাফ রিপোর্টারের প্রদত্ত সংবাদ' বাংলা কাগজে যা সব বেরোয় সেই ধারার আর কি! আজগুবি খবরের অবাক জলপান!.....'

'আসল কথায় আসুন না!' তাড়া লাগালেন ভালুক-মার।

'আসছি তো। সেই সময়ে গৌহাটির এক পত্রদাতা বাঘের উৎপাতের কথা লিখেছিলেন সম্পাদককে। তাই না পড়ে তিনি আমায় ডাকলেন, 'যাও তো হে, গৌহাটি গিয়ে বাগের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জেনে এসোতো। নতুন কিছু খবর দিতে পারলে এখন কাগজের কাটতি হবে খুব।'

'গেলাম আমি—কাগজ পেনসিল আর প্রাণ হাতে করে। চাকরি করি,না গিয়ে উপায় কি?'

'সেখানে গিয়ে বাঘের কীর্তি কলাপ যা কানে এলো তা অদ্ভুত; বাঘটার জ্বালায় কেউ নাকি গোরু-বাছুর নিয়ে ঘর করতে পারছে না। শহরতলীতেই তার হামলা বেশি, তবে ঝামেলা কোথাও কম নয়। মাঝে মাঝে শহরের এলাকাতেও সে টহল দিতে আসে। হাওয়া খেতেই আসে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু হাওয়া ছাড়া অন্যান্য খাবারেও তার তেমন অরুচি নেই দেখা যায়। একবার এসে এক মনোহারি দোকানের সব কিছু সে ফাঁক করে গেছে। সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রীম, লুডো খেলার সরঞ্জাম—কিছু বাকি রাখে নি। এমন কি, তার শখের হারমোনিয়ামটাও নিয়ে গেছে।

'আরেকবার বাঘটা একটা গ্রামাফোনের দোকান ফাঁক করলো। রেডিয়োসেট, লাউডস্পীকার, গানের রেকর্ড যা ছিলো, এমন কি পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম, সে সবের আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।

'আমি যেদিন পৌঁছলাম সেদিন সে এক খাবারের দোকান সাবাড় করেছিল। সন্দেশ-রসগোল্লার ছিটেফোঁটাও রাখে নি, সব কাবার। এমন কি, অবশেষে সন্দেশওয়ালার পর্যন্ত ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তক্ষুণি বাঘটার আশ্চর্য খাদ্যরুচির খবরটা তারযোগে কলকাতায় কাগজে পাচার করে দিলাম।

'আর, এই খবরটা রটনার পরেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। চিড়িয়াখানার কর্তা লিখলেন আমাকে—আমি বা গৌহাটির কেউ যদি অদ্ভুত বাঘটাকে হাতে নাতে ধরতে পারি—একটুও হতাহত না করে—আর আস্ত বাঘটাকে পাকড়াও করে প্যাক করে পাঠাতে পারি তা হলে তাঁরা প্রচুর মূল্য আর পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছেন।

'আর হ্যাঁ, পুরস্কারের অঙ্কটা সত্যিইলোভজনক—বাঘটা যতই আতঙ্কজনক হোক না! যদি হতাহত না করে—এবং না হয়ে—খালি হাতাহাতি করেই বাঘটাকে হাতানো যাবে কি না সেই সমস্যা।

'খবরটা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। গৌহাটির বড় বড় বাঘ শিকারী উঠে পড়ে লাগলেন বাঘটাকে পাকড়াতে।

'এখানে বাঘাবার কায়দাটা একটু বলা যাক। বাঘরা সাধারণত জঙ্গালে থাকে, জানেন নিশ্চয়? কোন কিছু বাগাতে হলেই তারা লোকালয়ে আসে। শিকারীরা করে কি, আগে গিয়ে জঙ্গালে মাচা বেঁধে রাখে। আর সেই মাচার কাছাকাছি একটা গর্ত খুঁড়ে—সেই গর্তের ওপর জাল পেতে রাখা হয়। জালর ওপরে জ্বালা! আবার শুকনো লতাপাতা, খড়কুটো বিছিয়ে আরে জালিয়াতি করা হয় তার ওপর, যাতে বাঘটা ঐ পথে ভ্রমণ করতে এলে পথ ভ্রমে ঐ ছলনার মধ্যে পা দেয়—ফাঁদের মধ্যে পড়ে, নিজেকে জলাঞ্জলি দিতে একটুও দ্বিধা না করে।

'অবশ্যি, বাঘ নিজগুণে ধরা না পড়লে, নিজের দোষে ঐ প্যাঁচে পা না দিলে অক্ষত তাকে ধরা একটু মুশকিলই বই কি! তখন সেই জঙ্গাল ঘেরাও করে দলকে দল দারুণ হৈ চৈ বাধায়। জঙ্গালের চারধার থেকে হট্টগোল করে, তারা বাঘটাকে তাড়া দেয়, তাড়িয়ে তাকে সেই অধঃপতনের মুখে ঠেলে নিয়ে আসে। সেই সময়ে মাচায়-বসা শিকারী বাঘটাকে গুলি করে মারে। নিতান্তই যদি বাঘটা নিজেই গর্তে পড়ে, হাত-পা ভেঙে না মারা পড়ে তা হলেই অবশ্যি।

'তবে বাঘ এক এক সময়ে গোল করে বসে তাও ঠিক। ভুলে গর্তের মধ্যে না পড়ে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ে—শিকারীর ঘাড়ের ওপর। তখন আর গুলি করে মারার সময় থাকে না, বন্দুক দিয়েই মারতে হয়। বন্দুক, গুলি, কিল, চড়, ঘুষি—যা পাওয়া যায় হাতের

কাছে তখন। তবে কিনা, কাছিয়ে এসে বাঘ এ সব মারামারির তোয়াক্কাই করে না। বিরক্ত হয়ে বন্দুকধারীকেই মেরে বসে—এক থাবড়াতেই সাবড়ে দেয়। কিন্তু পারতপক্ষে বাঘকে সেরকমের সুযোগ দেওয়া হয় না—দূরে থাকতেই তার বদ-মতলব গুলিয়ে দেওয়া হয়।

'এই হলো বাঘাবার সাবেক কায়দা। বাঘ মারো বা ধরো যাই করো—তার সেকেলে সার্বজনীন উৎসব হলো এই। গৌহাটির শিকারীরা সবাই এই ভাবেই বাঘটাকে বাগাবার তোড়জোড়ে নামলেন।

'আমি সেখানে একা। আমার লোকবল, অর্থবল, কিছুই নেই। সদলবলে তোড়জোড় করতে হলে টাকার জোর চাই। টাকার তোড়া নেই আমার। তবে হ্যাঁ, আমার মাথার জোড়াও ছিল না। বুদ্ধি-বলে বাঘটাকে বাগানো যায় কিনা আমি ভাবলাম।

'চলে গেলাম এক ওষুধওয়ালার দোকানে—বললাম, 'দিন তো মশাই, আমায় কিছু ঘুমের ওষুধ।'

'কার জন্যে?'

'ধরুন আমার জন্যেই। যাতে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা অকাতরে ঘুমোনো যায় এমন ওষুধ চাই আমার।'

বাঘের জন্যে চাই সেটা আর আমি বেফাঁস করতে চাইলাম না। কি জানি, যদি লোক-জানাজানি হয়ে সমস্ত প্ল্যানটাই আমার ভেস্তে যায়। তারপর গুজব যদি একবার রটে যায় হয়তো সেটা বাঘের কানেও উঠতে পারে, বাঘটা টের পেয়ে হুঁসিয়ার হয়ে যায় যদি?

'তা ছাড়া, আমাকে কাজ সারতে হবে সবার আগে, সব চেয়ে চটপট, আর সকলের অজান্তে। দেরি করলে পাছে আর কেউ শিকার করে ফেলে বা বাঘটা কোন কারণে কিংবা মনের দুঃখে নিজেই আত্মহত্যা করে বসে তা হলে এমন দাঁওটা ফসকে যাবে—সেই ভয়টাও ছিল।

'ওষুধটা হাতে পেয়ে তারপর আমি শুধালাম—'একজন মানুষকে বেমালুম হজম করতে একটা বাঘের কতক্ষণ লাগে বলতে পারেন?'

'ঘণ্টা খানেক। হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।'

'আর বিশ জন মানুষ?'

'বিশ জন? তা দশ-বিশটা মানুষ হজম করতে অন্তত ঘণ্টা তিনেক লাগা উচিত—অবশ্যি, যদি তার পেটে আঁটে তবেই।' জানালেন ডাক্তার বাবু। 'তবে কিনা, এত খেলে হয়তো তার একটু বদ-হজম হতে পারে। চোঁয়া ঢেঁকুর উঠতে পারে এক-আধটা।'

'তাহলে বিশ ইনটু তিন, ইনটু আট—মনে মনে হিসেব করি—হলো চারশ আশি। একটা বাঘের হজম শক্তি ইজ ইকোয়াল টু চারশ আশিটা মানুষ।তার মানে চারশ আশি জনার হজম-শক্তি। আর হজম-শক্তি ইজ ইকোয়াল টু ঘুমোবার ক্ষমতা।

'মনে মনে অনেক কষাকষি করে, আমি বলি, 'আমাকে এই রকম চারশ আশিটা পুরিয়া দিন তো, এই নিন ওষুধের টাকা। পুরিয়ার বদলে আপনি একটাবড় প্যাকেটও পুরে দিতে পারেন।'

'ডাক্তারবাবু ওষুধটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি এর সবটা খেতে চান খান, আমার আপত্তি নেই। তবে আপনাকে বলে দেওয়া উচিত যে এ খেলে যে প্রগাঢ় ঘুম আপনার হবে তা ভাঙাবার ওষুধ আমাদের দাবাই খানায় নেই। আপনার কোনো উইল-টুইল করবার থাকলে করে খাবার আগেই তা সেরে রাখবেন এই অনুরোধ।'

'ওষুধ নিয়ে চলে গেলাম আমি—মাংসের দোকানে। সেখানে একটা আস্ত পাঁঠা কিনে তার পেটের মধ্যে ঘুমের ওষুধের সবটা সেঁধিয়ে, তার পরে পাঁঠাটিকে নিয়ে জঙ্গাল আর শহরতলীর সঙ্গামস্থলে গেলাম। নদীর ধারে জল খাবার জায়গায় রেখে দিয়ে এলাম পাঁঠাটিকে। জল খেতে এসে জলখাবার পেলে বাঘটা কি আবার না খাবে?

'ভোর হতে না হতেই সঙ্গামস্থলে গেছি—বাঘটার জলযোগের জায়গায়। গিয়ে দেখি অপূর্ব দৃশ্য। ছাগলটার খালি হাড় ক'খানাই পড়ে আছে, আর তার পাশে লম্বা হয়ে রয়েছেন আমাদের বাঘা মক্কেল। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

'ঈস, কি ঘুম! রাস্তায় কোনো পাহারাওয়ালা কি পরীক্ষার্থী কোনো ছাত্রকেও এমন ঘুম ঘুমুতে দেখি নি!

'বাঘটার আমি গায়ে হাত দিলাম, ল্যাজ ধরে টানলাম একবার। একেবারে নিঃসাড়। খাবার নখগুলো, গুণলাম, কোনো সাড়া নেই। তার গোঁফ চুমরে দিলাম, পিঠে হাত বুলোলাম—পেটে খোঁচা মারলাম—তবুও উচ্চবাচ্য নেই কোনো।

'অবশেষে সাহস করে তার গলা টিপলাম। আদর করলাম একটু। কিন্তু তার গালে আমার টিপসই দিতেও বাঘটা নড়লো না একটুও।

'আরো একটু আদর দেখাবো কিনা ভাবছি। আদরের আরো একটু এগুবো মনে করছি, এমন সময়ে বাঘটা একটা হাই তুললো।

'তার পরে চোখ খুললো আস্তে আস্তে।

'হাই তুলতেই আমি একটা জাম্প দিয়েছিলাম—পাঁচ হাত পিছনে। চোখ খুলতেই আমি ভোঁ দৌড়। অনেক দূর গিয়ে দেখি উঠে আলিস্যি ছাড়ছে—আড়মোড়া ভাঙছে; গা-হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছে একটু। ডন-বৈঠক হয়তো সেটা, ওর রকমের কিছু একটা হতে পারে। কী যে—তা শুধু ব্যায়ামবীরেরাই বলতে পারেন।

'তার পর ডন-বৈঠক ভেঁজে বাঘটা চারধারে তাকালো। তখন আমি বহুৎ দূরে গিয়ে পড়েছি, কিন্তু গলে কি হবে, বাঘটা আমার তাক পেলো ঠিক। আর আমিও তাকিয়ে দেখলাম তার চাউনি। অত দূর থেকেও দেখতে পেলাম। আকাশের বিদ্যুৎঝলক যেমন দেখা যায়। অনেক দূর থেকেও সেই দৃষ্টি—সে কটাক্ষ ভুলবার নয়।

'বাঘটা গুড়ি গুড়ি এগুতে লাগলো—আমার দিকে। আমারো দৌড় বেড়ে গেল আরো—আরোও।

'গুড়ি গুড়ির থেকে ক্রমে তুড়ি লাফ বাঘটার।

'আর আমি? প্রতি মুহূর্তে তখন হাতুড়ির ঘা টের পাচ্ছি আমার বুকে।

বাঘটাও আসছে—আমিও ছুটছি বাঁচবার আশায়। ছুটছি প্রাণপণ.....'

বলতে বলতে আমি থামলাম।—দম নিতেই থামলাম একটু।

'তারপর? তারপর? তারপর?.....' আড্ডার ত্র্যহসপ্রশ্ন। বাঘের সম্মুখে পড়ে বিকল অবস্থায় আমি যাই যাই, কিন্তু তাঁদের মার্জনা নেই। তাঁরা দম নিতে ছাড়ছেন না।

'ছুটতে ছুটতে আমি এসে পড়েছি এক খাদের সামনে। অতল গভীর খাদ। তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষেনেই—সাততলার ছাদ থেকে পড়লে যা হয় তাই—একদম ছাতু! পিছনে বাঘ, সামনে খাদ—কোথায় পালাই? কোনদিকে যাই?

'দারুণ সমস্যা! এধারে খাদ, ওধারে বাঘ—ওধারে আমি খাদ্য আর এধারে আমি বরবাদ।

'কি করি? কী করি? কী যে করি?'

'ভাবতে ভাবতে বাঘটা আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।' বলে আমি হাঁফ ছাড়লাম। 'এতখানি ছুটোছুটির পর কাহিল হয়ে পড়েছিলাম।'

'তারপর? তারপর কী হলো?'

'কি আবার হবে? যা হবার তাই হলো।' আমি বললাম 'এ রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে।' আমার গপ্‌পো শেষ হলো সেইখানেই।

'কি করলো বাঘটা?' তবু তাঁরা নাছোড়বান্দা।

'বাঘটা?' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম 'কি আর করবে? বাঘটা আমায় গিলে ফেললো গপ্ করে।'

রসকাব্য

বোতামাভাব

দিগম্বর দাশগুপ্ত

বিয়ের জন্য ওয়ান টিপুন
প্রেমের জন্য দুই
ঘটক পেতে তিনের বোতামগধ
দেখে সাধন গুঁই
প্রশ্ন করেন, টিপবটা কি
সেকেণ্ড বৌ-য়ের জন্য?
দেখছি না তো তিনটে ছাড়া
বোতামটি আর অন্য।
অপারেটর কানে কানে
দিলেন তাঁকে জবাব,
প্রথম বৌ-য়ের গলা টিপুন
বোতামের খুব অভাব।

অঙ্কন প্রণব হোড়

বাসন কই?

আনন্দম্ শাস্ত্রী

এই দেখ 'ফেস' আর এই দেখ 'ফেসবুক',
সাইবার যুদ্ধে বুক করে ধুক্‌পুক্।
'গিমিক' দেখায় কেউ, কেউ বা দেখায় 'গিগ'
এ বলে আমি 'বড়' ও বলে আমি 'BIG'
কুৎসা, চর্চা, নিন্দা, ঠাট্টা
লাল, নীল ঘুড়িদের শুধু ভো-কাট্টা।
গ্রাম আছে অনাদরে, খুন আর খারাবি,
পথে-ঘাটে ধর্ষণ, জুয়া আর শরাবি।
শিশুদের কান্না—চোখ কে মুছবে?
বাসনটা মেজে দিলে দুঃখ কি ঘুচবে?
শুকনো চিড়ে আর কথাতে ভেজে না,
অভুক্ত পেটে আজ, থালা কেউ মাজে না।
অনায়াসে ক'ন যিনি—ভালো মুখ কথাতে
বাসন মাজতে পারি সকাল ও রাতেতে।
চুপি চুপি বলি তারে—সত্যটা দেখে যান,
থালা বেচে চাল কিনে যত লোক ভাত খান।
বাসনটা মাজবার লোক নেই দরকার,
বাসনটা কিনে দিক আমাদের সরকার।

জবর খবর

হরির লুট

টাকা ডবল করতে চান? চলে যান এ টি এম-এ। মুখে মুখে খবরটা চাউর হয়ে গেল গোটা মধ্য লন্ডনে। হুড়মুড়িয়ে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন লাইনে। সত্যি তো, দশ পাউন্ড চাইলেই বেরিয়ে আসছে কুড়ি পাউন্ড! লুটে নে, লুটে নে! মুদ্রণযন্ত্রের ভৌতিক কাজ-কারবারের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় মুদ্রাগণনাকারী যন্ত্রও যে ভৌতিক খেয়াল-খুশিতে চলতে পারে তা কে জানত? শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ত্রুটিটা নেহাৎই মানবিক। জনৈক কর্মচারী ভুল করে দশ পাউন্ডের নোটের ট্রে কুড়ি পাউন্ডের নোট দিয়ে ভরে রেখে গিয়েছিলেন।

তার চেয়েও চমকপ্রদ ঘটনা গৌহাটিতে। ভারতীয় মুদ্রার যে এখনো ভরাডুবি হয়নি সেটা প্রমাণ করতেই বোধহয় বানের জলে ভেসে এসেছে গাদা গাদা পাঁচশ ও হাজার টাকার নোট। চাচাল এলাকার জেলেদের জালে নোট ধরা পড়তেই টিভি চ্যানেলরাা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুযোগ বুঝে। ব্যস, প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শত শত নগরবাসী বিছিয়ে দিলেন জাল, দু-চারটি নোট পাকড়ানোর অভিপ্রায়ে। পুলিশের সাধ্য কি সে জালিয়াতি থামায়! কিন্তু কার যে এত এত নোট জলে গেল তা এখনো জানতে পারা যায়নি।

হা ঈশ্বর

চারিদিকে হুলুস্থুল। আবিষ্কার হয়েছে ঈশ্বর-কণা, যার পোশাকি নাম—Higgs Boson. শুধু পিটার হিগ্‌স-ই নন, আরো জনা পাঁচেক পদার্থবিদ আন্দাজ করেছিলেন এই কণার কথা, যা বস্তুভর-এর জন্য দায়ী। এটি Boson শ্রেণীর কণা অর্থাৎ Bose-Einstein Statistics মেনে চলে। কিন্তু ঈশ্বর-কণা—এই নামকরণ কেন? জনৈক বন্ধু বললেন—একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে লিখেছে—প্রথমত এই কণাকে চোখে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত এই কণা সবকিছুর মধ্যেই আছে। তৃতীয়ত, এই কণা সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছে। চতুর্থত এই কণা সৃষ্টির সময়ে ছিল। তাই নাকি ইনি ঈশ্বর।

বেচারি বন্ধু! জানেন না বোধহয়, এই যুক্তিগুলো প্রাথমিক কণার ক্ষেত্রেই খাটে। আসলে ঈশ্বরত্বের কাহিনীটা এইরকম

১৯৯৩ সালে পদার্থবিদ লিওন এম লেডারম্যান এবং লেখক ডিক টেরেসি—দু'জনে একটি বই লেখেন। বইয়ের নাম দেন Higgs Boson. আপত্তি জানালেন প্রকাশক—এই নামে বই বিক্রি হবে না। রেগেমেগে লেখকরা নতুন নামকরণ করলেন God damn particle. কেন না অতি প্রয়োজনীয় কণা হলেও তিনি তখনো অধরা। প্রকাশক কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। damn শব্দটিকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি রাখলেন শুধু God-কে। অতএব বইয়ের সর্বশেষ নামকরণ হল— The God Particle If the Universe is th Answer, What is the Question? অর্থাৎ, "মানুষই দেবতা গড়ে/ ব্যবসাবৃত্তির 'পরে/ করে দেব-মহিমা নির্ভর।

—সংঘমিত্রা কর

অঙ্কন সন্দীপ দেবনাথ

রসকাব্য

রসপাষণ্ডের ছিমেরিক

বাঙালি

দেশজননী চোখের মণি বাংলা হল মা।
বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নাইকো তুলনা।।
কবিগুরুর কথা মতো
এই দেশে জন্মাল যত,
সাত কোটি হয় তেইশ কোটি করলে গণনা।
বাঙালি সব হয়েই রইল মানুষ হল না।।

নেতার বক্তৃতা

বাজিয়ে মাইক দাপিয়ে পাড়া লেকচার দেন বক্তা।
মাঠের মধ্যে ঘাস চিবিয়ে হজম করছে লোক তা।
সেই নেতা হন মুর্খ যতই
লেকচার হয় দীর্ঘ ততই,
শুনতে হবে ভাষণটা তাঁর যতই রদ্দি হোক তা।
না শুনবে তো পার্টির ক্যাডার পিটিয়ে করবে তক্তা।।

টেলিভিশন

টেলিভিশনে ভীষণ রকম বাংলাটা বরাদ্দ।
বানানগুলো দেখতে শুনতে পড়তেও অখাদ্য।
হট্টগোলে বেজায় মত্ত,
ভুলেই গেছে ণ-ত্ব ষ-ত্ব,
পেটের মধ্যে বেহাল বিদ্যা, ছুঁচো বাজায় বাদ্য।
হোথায় বসে হচ্ছে.ক'ষে বাংলা ভাষার ছাদ্দ।।

ইউনিয়নের পাণ্ডা

ধর্মঘটি কর্মচারী ইউনিয়নের পাণ্ডা।
রক্তচোখের হুমকি শুনে প্রাণ হয়ে যায় ঠাণ্ডা।
বাঁচার লড়াই, রুটির লড়াই—
গেট মিটিঙে গলার বড়াই,
ম্যানেজমেন্টের পয়সা খেয়ে মাথায় ঘোরান ডাণ্ডা।
মজদুররা চুষতে থাকে অশ্বতরর আণ্ডা।।

সরকারি দপ্তর

সরকারি দপ্তরে গিয়ে কাজটা পেতে চাইলে।
মুখটা করে রাখেন বাবু বাংলা পাঁচের স্টাইলে।
দু'চারটি নোট গোপন গোপন
করতে হবে ট্রানজাকশন
তবেই বাবুর তুষ্টি সাধন নইলে পড়ে রইলে।
ডাণ্ডা খাবে ওঁদের নামে একটা কিছু কইলে।।

পুলিশ

হাত পেতে রয় থানার পুলিশ, দিতেই হবে পয়সা।
নইলে কোথাও প্যাঁচে ফেলে উল্টে দেবেন ব্যবসা।
ব্যবসাদারও মওকা পেয়ে
যায় চালিয়ে ডাইনে বাঁয়ে,
সেন্ট্রি থেকে ওপরওলা—ভাগ হচ্ছে হিস্সা।
পেনের কালি যায় শুকিয়ে লিখতে ওঁদের কিস্সা।।

দুষ্ট শক্তি ছেড়ে দিয়ে সুস্থ শক্তি নিন
কৃত্রিম শক্তি বা এনার্জিতে দূষণের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সূর্য ? অনাদি কাল ধরে তা শক্তি দিয়ে চলেছে।—ওঁ প্রণতোহস্মি দিবাকরম্......

GEETANJALI SOLAR ENTERPRISE

(DOUBLE NATIONAL AWARD WINNER)

Manufactures of SOLAR ENERGY SYSTEMS

Solar Photovoltaic Lighting Systems, Solar Water Heating Systems, Solar Toy's etc.

KOLKATA UNIT

P-14, KASBA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE-1
E. M. BY PASS, EAST KOLKATA TOWNSHIP
KOLKATA-700 107
(033) 2442-0773/4027
Fax (033) 2442-0773
e-mail gse@cal.vsnl.net.in
website www.geetanjalisolar.com

NORTH BENGAL UNIT

23B, GABGRAM INDUSTRIAL ESTATE
PHULBARI, SATELLITE TOWNSHIP,
SILIGURI, JALPAIGURI
99037-48253, 99037-94158

অঙ্কন প্রণব হোড়

ফেবু

সুবীর ঘোষ

বিকেলবেলায় হাঁটতে বেরিয়ে তারক জ্যাঠার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল ফেবুর। ফেবুর কম্পিউটারের ব্যবসা। দেবুকে দেখেই তারক জ্যাঠা বলে উঠলেন—হ্যাঁরে দেবু, তোর কি একটা ভাই হয়েছে?

এমনিতেই দেবুর চোখদুটো বড় বড়। একথা শুনে সেই চোখ ডবল ডবল হয়ে গেল। বলে উঠল,—আমার ভাই! আমার মেয়ের বয়েসই তো হল গিয়ে পনেরো।

তারক জ্যাঠা এবার একটু পিছিয়ে গেলেন,—তবে কি আমিই ভুল শুনলাম? ঐ যে ওরা কি সব বলছিল, দেবু ফেবু......

—দেবু তো আমিই। আমি ছাড়া এ তল্লাটে আর কোনো দেবু নেই। আর ফেবু একটা আছে, কিন্তু সেটা তো.....

—সেটা কি? তোর কেউ হয়-টয় নাকি?

—আরে সেটা অন্য জিনিস। সেটা একটা নেটওয়ার্ক সাইট...মানে সেটা একটা দেয়াল।

—দেয়াল! দেয়ালেরও কান আছে শুনেছি, নামও আছে জানতাম না।

—এটা একটা অন্যরকম দেয়াল। তোমরা আগেকার লোক। তোমাদের ঠিক বোঝতে পারব না।

—কি জানি বাবা। আমরা তো চিরকাল শুনেছি বার্লিনের দেয়াল আর চীনের পাঁচিল। তার বাইরে আর তো কিছু শুনিনি। আর এক দেয়াল ছিল আমাদের অল্প বয়েসে—মনোরমা সিনেমা হলের বাইরে সিনেমা শো-এর ইন্টারভ্যালে ব্যাটাছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে....

কথা শেষ না করে গজগজ করে চলে গেলেন তারক জ্যাঠা।

দেবুও তার দোকানে গিয়ে প্রথমেই ফেসবুক খুলে বসল। দেখল তার বৌ লিখে রেখেছে—হলুদ শেষ, আসার পথে নিয়ে আসবে এক প্যাকেট। গত চারদিন ধরে ভারতী কোনো কথা বলছে না দেবুর সঙ্গে। যা বলার লিখে দিচ্ছে। মোবাইলে এস এম এস করতে খরচা আছে। ফেবুর দেয়ালটা তো ফ্রী। লিখে দিলেই হল। দেবুর চোখে পড়ল, তার বন্ধু-তালিকার মধ্যে একজনের আজ জন্মদিন। দোকানের কাজে ব্যস্ত থাকায় সকালে ফেসবুক খুলতে পারেনি। সকালে অভিনন্দন জানানোর রীতি। কি আর করা যাবে। বেটার লেট দ্যান নেভার। একজনের পোস্ট থেকে কপি করে হ্যাপি বার্থডে পোস্ট করেছিল বার্থডে বয়-এর উদ্দেশ্যে। এ মজা মন্দ নয়। কার্ড কেনার খরচা নেই। মিষ্টি কিনতে হয় না। গিফ্‌টের ঝামেলা নেই। শুধু দেওয়ালে লিখে দাও। কবি সুকান্তর সময় ফেবু ছিল না। কিন্তু তিনি বোধহয় জানতেন দেয়াল লিখন এক সময় ভোটপর্বেই শুধু নয়, অষ্টপ্রহরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই তো তিনি লিখে গেছেন—

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে লিখি কথা
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা।

মাউস ঘোরাতে ঘোরাতে দেবুর নজরে এল, কেউ একহাঁড়ি রসগোল্লা টাঙিয়ে গেছে দেয়ালে। শত ইচ্ছেতেও একখানাতেও হাত দেবার জো নেই। তাই সে একফোঁটা চোখের জল ফেলে দিয়ে লিখে রাখল—ভূতের রাজা দিল বর।

তারক জ্যাঠা খুব আশা করেছিলেন এবার ভোটের সিজনে দেয়াল ভাড়া দিয়ে টু-পাইস কামাবেন। দেয়াল ইজারা নিতে লোকও এসেছিল। কিন্তু বায়না ক্যানসেল করে গেল সেদিন। বলল—আমরা অন্য দেয়াল পেয়ে গেছি।

ওরা চলে যেতেই দেয়ালগুলো জবরদখল করে নিল ঘুঁটেকুড়ানির দল। সুবোধ মুখোপাধ্যায় সেটা দেখে যেতে পারলেন না। তিনি সেসময় যা দেখেছিলেন তাই লিখে গেছেন—ঘুঁটেকুড়ানির দেয়াল নিয়েছে ভোটকুড়ানির দল।

দেবু এক মন দিয়ে গিন্নির পোস্টের লাগসই জবাব দিচ্ছিল, এমন সময় আবার এসে হাজির তারক জ্যাঠা। একটু কেসে নিয়ে বলে উঠলেন—কী দেবু, টিভি-তে কী দেখছ—সিরিয়াল না সিনেমা?

—জ্যাঠা এটা টিভি নয়। এটা কমপিউটার। এখানেই তো ফেবু করি।

—তুমি দেবু, করো ফেবু। আমার তো সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

—ফেবু মানে ফেসবুক।

—ফেসবুক! মানে মুখ আর বুক।

—দুটোই এখানে দেখানো যায়।

—এক্স-রে মেশিন আছে নিশ্চয়।

—ঐ রকমই কিছু একটা।

—আমার বুকের একটা ফটো করা যাবে?

—না না অতসব হয় না। এ গুলো মিছিমিছি।

—মিছিমিছি! ঐ যে বললে মুখ আর বুক?

—হ্যাঁ, ওগুলো দেখানো যায়।

—তার মানে মেয়েদের মুখ আর ছেলেদের বুক, তাই তো?

—ধরুন তাই।

—'ধরুন তাই' বলছ কেন? সত্যিটা কি?

—এখানে মুখের কথা বুকের কথা দুই-ই পাবেন।

> গত চারদিন যে বাক্যহীনতার মুখবন্ধ চলছে তা নিমেষে ভুলে গিয়ে ভারতী কিশোরীর খুশিতে বলে উঠল—ডিজিটাল ক্যামেরাটা এনে শিগগির ছবি তোলো। তুলে ফেবুর দেওয়ালে পোস্ট করে ট্যাগ করে তবে আমি মাছে হাত দেব।

—মুখের কথা মানে ছেঁদো কথা, আর বুকের কথা মানে প্রাণের কথা?

—ধরুন তাই। তবে দুটো শব্দের একটা ইংরেজি একটা বাংলা ধরলে হবে না। দুটোই ইংরেজি ধরতে হবে।

—বি ও ও কে বুক। বুক মানে বই। তাই তো?

—হ্যাঁ তাই।

—কিন্তু এটা তো বই নয়, এটা তো কমপিউটার।

—ঐ কমপিউটারই হল এ যুগের স্বর্গরাজ্য। এখানেই খাতা-কলম খাম-পোস্টকার্ড ঘড়ি-ক্যামেরা রেডিও-রেকর্ডপ্লেয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া খবরের কাগজ ক্যানভাস রং-তুলি ফোন-অ্যালবাম সব পাবেন।

—তা তুমি এখন কোনটা ব্যবহার করছ?

—আমি চিঠি লিখছি। গিন্নিকে।

—গিন্নিকে? এই তো বাড়ি থেকে এলে। এখনই পৌঁছ-সংবাদ দিতে হবে?

—পৌঁছ-সংবাদ নয়। ওর হলুদগুঁড়ো লাগবে সেট জানিয়েছে।

—হলুদ গুঁড়ো চাই, সেটা জানাতে এই যন্ত্র! ফর্দ দিলেই তো হত।

—ফর্দ আজকাল ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে।

—কে যেন ছবি এঁকেছিল বলে ধরে নিয়ে গেছে শুনলাম।

—ফটোশপে করেছিল বোধহয়।

ফটো বাঁধানোর দোকানে আজকাল এসব হচ্ছে নাকি?

—আরে না না জ্যাঠা, ফটো বাঁধাইয়ের দোকান নয়, ছবি আঁকার দোকান।

—সেখানে কেমন আঁকা শেখানো হয়?

—তা ধরুন আপনি, আপনাকে আঁকল, আপনাকে দোলনায় বসাল, পাশে বসিয়ে দিল মধুবালাকে। আপনারা 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' হয়ে গেলেন।

—মধুবালা!—এই বলে ফিক্ করে হেসে ফেললেন তারক জ্যাঠা। —তোমাদের যত সব কঠিন কঠিন কথা। বোঝা যায় না।—বলে দুম্ করে উঠে পড়লেন।

রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় দেবু এক প্যাকেট হলুদগুঁড়ো আর একটা বোয়াল মাছ নিয়ে বাড়ি ঢুকল। ভারতীর বোয়াল খুব পছন্দের। ভারতী মাছ কাটা থেকে রাঁধা পর্যন্ত সবেতেই এক্সপার্ট। গত চারদিন যে বাক্যহীনতার মুখবন্ধ চলছে তা নিমেষে ভুলে গিয়ে ভারতী কিশোরীর খুশিতে বলে উঠল—ডিজিটাল ক্যামেরাটা এনে শিগগির ছবি তোলো। তুলে ফেবুর দেওয়ালে পোস্ট করে ট্যাগ করে তবে আমি মাছে হাত দেব।

ফেবুতে ভারতী পোস্টিং করছে আর পাশে দাঁড়িয়ে দেবু মন্ত্রপাঠ করছে—ওঁ স্বাহা। নমঃ দেয়ালায়ঃ।

বোয়াল মাছের ঝাল-ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে চারদিন পর ভারতী দেবুর পাশে এসে শুয়েছে। সাময়িক অস্ত্রবিরতি এবং মহাভারতের সন্ধিপর্ব।

ভারতী ফিস্‌ফিস্ করে বলল—আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাচ্ছি, তাই না?

—একটু খুলে বলো।

—খোলাই তো আছে সব।

—আহা সে খোলা নয়। কথাটা খোলসা করে বলো।

—বলছি। আমরা যখন ছোট ছিলাম খেলনা-পাতি খেলতাম। মেয়েরা রান্নাবাটি করত। পুতুলের বিয়ে দিত। ভোজ হত। বালির পোলাও। ভেরেণ্ডা ফলের তরকারি, ফুলের মাংস। বন্ধুরা বলত—আঃ কি টেস্ট রান্নার! প্লাস্টিকের গরুর এক বালতি দুধ দোয়ানো হত। সেই দুধ আমাদের ছেলেপুলেরা খেত। সব ছিল সাজানো। শুধু মজাটাই ছিল সত্যি। আর এখন এই যে ফেবু যুগ এসেছে আমাদের জীবনে, এটাও তেমনি সাজনো, শুধু মজাটা মিথ্যে নয়। কারোর জন্মদিন—চিনি না জানি না, উইস করলাম। কেউ আমাকে কার্ড পাঠাল। দেখলাম, হাতে পেলাম না। কেউ কেক পাঠাল, দেখলাম, খেতে পারলাম না। কারোর অসুস্থতায় খবর পেয়ে দেখতে গেলাম না, শুধু লিখে দিলাম—উদ্বিগ্ন, সেরে ওঠো।

—খারাপ কি? দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

—ভাই বন্ধু—এসব কি সত্যিই গড়ে উঠছে?

—কিছুটা তো হচ্ছে। সবার মুখেই তো আর মিছরির ছুরি নেই।

—তবে হ্যাঁ, থানয় ডায়েরি না করেই হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে।

—পুরনো প্রেমিককে খুঁজে পেয়েছ নাকি?

—খুঁজিনি। খুঁজলে হয়ত পাব। তবে পূর্বপুরুষদের খুঁজে পেয়েছি। তাঁরা স্বর্গে বসেও রেগুলার ফেবুর দেয়াল-পত্রিকায় মনের কথা লিখে যাচ্ছেন। ✂

কার্টুন : বিপ্লব ভট্টাচার্য

কবিতা কিংবা গানের প্যারডি আমাদের কাছে অতি পরিচিত। এবং হয়ত বা একটু কম বুদ্ধিদীপ্ত লাগে। কিন্তু রামায়ণের মতো এক বিশাল মহাকাব্য—পৃথিবীর আদিতম এপিক, তার যে এমন যুগোপযোগী প্যারডি, মানে ব্যঙ্গের রসে চুবিয়ে, জারিয়ে সমকালের নিরীখে উপভোগ্য করে তোলা যায়, তা মারায়ণ না পড়লে বুঝতে পারতাম না।.......

—জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র

মারায়ণ (আদি কাণ্ড) ১৪০.০০

পত্রপাঠ প্রকাশনা

১০জে, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯

অবিবাহিত পুরুষ তার বাগ্‌দত্তা রমণীকে বলল,—আমার আগের অন্য মেয়ের সাথে যে অ্যাফেয়ার ছিল তা তোমার কাছে স্বীকার করতে চাই।

রমণী বলল,—তুমি দু'সপ্তা আগেই তা আমাকে বলেছ—এবং আমি তা মেনে নিয়েছি। এখন আবার সে কথা কেন বলছ?

—এবার সত্যি করে তোমায় বলছি ডার্লিং, দু'সপ্তার পরেও আরেকটা মেয়ের সাথে আমার অ্যাফেয়ার ছিল যা তোমাকে বলা হয়নি।

❋ ❋ ❋

রাত্রে স্ত্রী তার স্বামীকে সিগারেট আনতে বলল। স্বামী গিয়ে দেখল সিগারেটের দোকান বন্ধ। কাছাকাছি একটা বার-এ সিগারেট পেতে পারে বলে সে ঢুকল। সেখানেও সিগারেট না পেয়ে বেরুতে যাবে, এমন সময় চোখাচোখি হলো তার এক পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে। সে বসে একা মদ খাচ্ছিল। ওকে পাশে বসিয়ে দু'জনে অনেক মদ খেয়ে ওকে নিয়ে তার ফ্ল্যাটে গেল। ভোর তিনটের সময় ওকে ছেড়ে দিল।

বেরুবার সময় সে বান্ধবীকে বলল,—এত রাতে ফেরার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি আমার হাতে ট্যালকম পাউডার ঢালো।

সে দুই হাতে ভালোভাবে ট্যালকম পাউডার ঘষে বাড়ি গেল।

বেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী দরজা খুলে গালাগালি করে বলল,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বাড়িতে না ঢুকলেই পারতে!

স্বামী যা ঘটেছিল সব বলল। স্ত্রী বলল,—সব মিথ্যে কথা। তোমার হাত দেখাও।—হাতে পাউডারের গন্ধ পেয়ে বলল, তুমি বান্ধবীর গল্প যা বলছ সব মিথ্যা কথা। তুমি আবার জুয়ার আখড়ায় গিয়েছিলে।

—সুবোধ চন্দ্র পাল

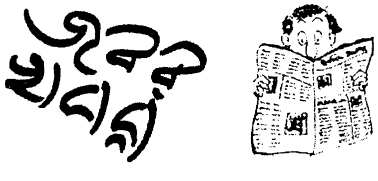

ছি ছি ছি

গোয়ার "পণ্ডা" শহরে একটি জনপ্রিয় আইসক্রিম পার্লার। জনৈক কর্মচারী চমকে উঠলেন একটি দৃশ্য দেখে। হতবুদ্ধি ভাব কাটতেই দৃশ্যটিকে বন্দী করে ফেললেন মোবাইল ফোনে। অতঃপর ভিডিওটি সটান চালান হয়ে গেল স্থানীয় টিভি চ্যানেলের অফিসে। শহরসুদ্ধ লোক টিভিতে দেখলেন, পার্লারের মালিক রেচন পদার্থ ত্যাগ করছেন আইসক্রিম বানানোর পাত্রে। তবে কি ওই জল দিয়েই.....ছি ছি ছি!

খাদ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টররা ছুটলেন পার্লারে তালা ঝুলিয়ে দিতে। আর পার্লারের নিয়মিত খদ্দেররা গলায় আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন বেসিনের সামনে।

—সংঘমিত্রা কর

অনর্থ

শব্দ	প্রকৃত অর্থ
ঝাড়ুদার	সাফাই কর্মী
পকেটমার	হাতসাফাই কর্মী
ঝি	কাজের মাসি
চাকর	কাজের মামা/কাজের মেসো
গোস্বামী	ষাঁড়। ক্ষেপে গেলে যে পথচারীকে পদানত করে।
স্বামী	স্ত্রীর পদানত যিনি।
আসামি	আইনকে পদানত করেন যিনি
চোর	না বলিয়া যে পরের দ্রব্য লয়।
ডাকাত	বলিয়া যে পরের দ্রব্য লয়।

—অমিত গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা বন্ধু, তাই বন্ধুর পথে হাতে হাত রেখে বন্ধুর মতো চলি। জনতার দরবারে গিয়ে একে অপরের কথা বলি। 'পত্রপাঠ' আমাদের প্রিয় সখা, কিংবা তারও অধিক। 'আনন্দ সংবাদ'-এর সঙ্গে

আনন্দ সংবাদ

বিশ্বজোড়া বাঙালির কাছে বাঙলা ও বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র পত্রিকা

সম্পাদক : সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী (০) ৯৩২১১ ৪৭৭৯৭

Anando Sangbad, B-206 Aditya Anirudh, Ashima Marg, Chinicholi Bunder, Malad (W) Mumbai-400 064, India. Ph (0091-22-3290 9367/ 3292 0098/ 2384 0196

পত্রপাঠ কয়েদখানায় আইয়ে জনাব আইয়ে

গিরেফ্‌তার হওয়া নয়া কয়েদীগণ

কয়েদী নং	নাম ও পূর্বাশ্রম	রসিদ নং ও তারিখ	মেয়াদ
০৮/১২৯০৩	অগ্নিবেশ রায়, হাওড়া-৭১১৪০১	৬১১/১৩-০৭-২০১২	আগস্ট ২০১২-জুলাই ২০১৩
০৮/১২৯০৪	বরিষা প্রামাণিক জানা, খানাকুল	৬১২/১৪-০৭-২০১২	আগস্ট ২০১২-জুলাই ২০১৩

(কয়েদীদিগের এই খতিয়ান ২৫ জুলাই ২০১২ মোতাবেক)

পত্রপাঠ কয়েদখানায় পায়ের ধুলা দিলে আমরা এইরূপ আন্তরিকতার সহিত নূতন কয়েদীদিগকে বরণ করিয়া লই।

পত্রপাঠ কয়েদখানায় কয়েদীয়ানা বহাল রাখার জন্য বহুৎ বহুৎ শুকরিয়া

কয়েদী নং	নাম ও পূর্বাশ্রম	রসিদ নং ও তারিখ	মেয়াদ
৯/০৪৩৭২	সবিতা ঘোষ, মানকুণ্ডু, হুগলী	৫৮০/০৬-০৭-২০১২	সেপ্টেম্বর ২০১২-আগস্ট ২০১৩
৪/০৬৪৯৬	অধ্যাপক গৌতম মল্লিক, কলকাতা-৩২	৫৮১/০৭-০৭-২০১২	এপ্রিল ২০১২-মার্চ ২০১৩
২/০৭৫৪৭	অশোকা মণ্ডল, শকুন্তলা পার্ক, কল-৬১	৫৮২/০৭-০৭-২০১২	ফেব্রুয়ারি ২০১২-জানুয়ারি ২০১৩
৫/০৭৫৭১	বিপুলকুমার নন্দী, বেহালা, কল-৩৪	৫৮৩/১৩-০৭-২০১২	মে ২০১২-এপ্রিল ২০১৩
৫/০৩২১৬	অজিত বসু, কলকাতা-১২	৫৮৪/১৩-০৭-২০১২	মে ২০১২-এপ্রিল ২০১৩
২/০৯৭২১	ডঃ উৎপল সান্যাল, কলকাতা-৩০	৫৮৫/১৬-০৭-২০১২	ফেব্রুয়ারি ২০১৩-জানুয়ারি ২০২৩
৫/০৩২২১	মেদিনীশঙ্কর চৌধুরী, আমতা, হাওড়া	৫৮৬/২০-০৭-২০১২	এপ্রিল ২০১০-মে ২০১২
৬/০৮৬৫৮	মঙ্গলপ্রসাদ দত্ত, পঃ মেদিনীপুর	৫৮৭/২৫-০৭-২০১২	জুন ২০১২-মে ২০১৩

(কয়েদীদিগের এই খতিয়ান ২৫ জুলাই ২০১২ মোতাবেক)

ভাবলেই ভ্যাবাচ্যাকা

কচিগল্প

সন্দীপ রুদ্র

অঙ্কন সন্দীপ দেবনাথ

তখন দুপুর দুটো কি তিনটে হবে। গরমে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। সবে মাত্র বরফ দেওয়া এক গ্লাস সরবত এঁকে রং করছি, তারপর খাব। ওমা জানলার ওপারে খুব হাসাহাসির শব্দ। একে গরম, তার ওপর হাঁউমাউ করে কে হাসছে। খ'চে একদম খচ্চর হয়ে উড়ে গেলাম জানলার কাছে। দেখি তো কে দাঁত চুলকাচ্ছে! ও বাবা! দেখি ওপাড়ার নেড়ি কুত্তাটা কি একটা পড়ছে আর তাতেই হাসতে হাসতে তার হাঁসফাঁস অবস্থা। জানলা দিয়ে চোখ বাড়িয়ে দেখি, আ মলো যা, নন্টে-ফন্টে পড়ছে। আর তাতেই হাসি থামছে না। এমন দাঁত খ্যাঁচালাম, শালা আমারই দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

এদিকে বাবা আমাদের পাড়ার কুকুরগুলো ভালো। ব্যোমকেশ, ফেলুদা, ঋজুদা ছাড়া পড়েই না। লালুটা আবার শার্লক হোমস্-এর খুব ভক্ত। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলি, প্লিজ মানুষ ছাড়া কাউকে বলবেন না। আমাদের বাড়ির মেনি বেড়ালটা সুনীলবাবুর কবিতার খুব ভক্ত। একদিন দেখি নতুন একটা হুলোকে 'কেউ কথা রাখেনি' আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে।

তবু ভালো। হুলোগুলো হাড়ে বজ্জাত। 'বটতলার' সাহিত্য ছাড়া আর কিছু পড়েই না। না না, আমি সন্দেশ পড়ি না। ওটা নিই পিঁপড়েগুলোর জন্যে। ব্যাটাদের বয়েসের গাছ-পাথর নেই ব'লে বলে কিনা সন্দেশ ছাড়া পড়ব না। বাধ্য হয়েই নিতে হয়। এই তো গেল দিন, আমাদের বাড়িতে যে গরুটা রোজ আসে খাবার জন্যে, সেদিন হয়েছে কি, আমি কাগজে মুড়ে আমারই একটা কবিতার বই খেতে দিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, খাওয়া দুরস্থ, দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। আচ্ছা আপনারাই বলুন, রোজ রোজ রবীন্দ্র রচনাবলী কোথায় পাই? বাবুর রবীন্দ্র রচনা সমগ্র ছাড়া মুখে কিছু রোচে না। ওটায় নাকি জাবর কাটতে সুবিধে হয়। হতভাগা হাড়-হাভাতে গরু কোথাকার!

আরে তাও তো ভালো, এদের স্বভাব টিকটিকিগুলোর মতো নয়। ব্যাটারা কিছু জানে না, বোঝে না, কিছু করবার মুরোদ নেই, খালি অন্যের কথায়, লেখায় টিক্‌টিক্ করে মরে। ওদের দেখলেই গা জ্বলে যায়।

কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। গাধারা, মানে যে ক'জনকে দেখেছি আর কি, তারা সবাই দেশ পড়ে। ব্যাপারটায় বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী গন্ধ আছে বলে আর নাক ঘামাইনি। মরুক গে যাক, আমার কি!

তবে একটা ব্যাপার খুব মজার, নিশাচরগুলো, মানে প্যাঁচা, বাদুড়—এরা, এদের আবার জাতীয় কবি জীবনানন্দ। আমি কোনো প্রশ্ন করায় বলে কিনা—ও-ই সবথেকে বেশি আমাদের প্রাধান্য দিয়েছে।

তখন আমি বললাম,—কেন, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কালীপ্রসন্নের, সেও তো...

মুখের ওপর কি বলল জানেন, বলে ওটা নাকি সাম্প্রদায়িক। বুঝুন ঠ্যালা। ঐ যে হুতোম প্যাঁচা লেখা আছে!

তবে কাকেদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি ওরা বেশিরভাগ শরৎবাবুকে পছন্দ করে। কয়েকটা কাকের সঙ্গে কচ্‌কচানি করার সুবাদে জেনেছি যে—দেবদাস ওদের খুবই প্রিয় উপন্যাস। হবে না! ঝাড়ুদাররা দেবদাসের মতোই দ্বারে দ্বারে ঝাড় খায় কিনা, তা ওদের তো দেবদাস পছন্দ হবেই।

দাঁড়কাকরা অবশ্য ভৌতিক উপন্যাস পড়ে। এর প্রমাণ পেয়েছিলাম যখন আমার ভৌতিক উপন্যাস 'ভুতোর জীবনে ভূতের ভূমিকা' বেরিয়েছিল। তখন সবকটা কপি দাঁড়কাকেরাই ঝেঁপে দিয়েছিল। কিছু করার নেই। ওদের না ঘাঁটানোই ভালো। কখন জীবনে দাঁড়ি টেনে দেবে বলা যায় না বাবা! যাক, কেউ তো পড়ল!

চোখে জল চলে আছে। ভাবলেই মনটা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আহাহা! কী ভক্তি! শুধু সারাদিন মা মা, মানে ইয়ে আর কি, ম্যা ম্যা। শুধুই মাকে ডাকছে দিন নেই রাত নেই। দেখা দে মা, দেখা দে। উপনিষদ, গীতা, ঠাকুরদের বই ছাড়া ছাগলরা আর কিছুই পড়বে না। অবশ্য আমাকে ওরা খুব একটা সহ্য করতে পারে না। একবার খাসির মাংসের হাড় চিবুতে গিয়ে আমার একটা দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। সেই রাগে আমি একখানা ছোটগল্প লিখেছিলাম 'ছ্যাঁচড়া ছাগল' ব'লে। সেই থেকে সম্পর্কটা হোমিওপ্যাথি আর অ্যালাপ্যাথি হয়ে আছে।

এই রে, দেখেছ তোমাদের সঙ্গে বকবক্ করতে গিয়ে ভুলেই গেছি, সরবতটা যে উবে যাবে! না আগে গিয়ে খেয়ে আসি, তারপর আবার কথা হবে।

বড় বড় কথা নয়, নিতান্তই বিজ্ঞানসম্মত
পন্থায় যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করেন—

আনন্দময় শাস্ত্রী

(বি. এ., বি. এস. সি., রাজজ্যোতিষ)

চেম্বার সোনার সংসার জুয়েলার্স (বেলেঘাটা)
ফোন ৯৮৩১৬ ৭৮৪৭৮
পার্লোফোন (কলেজ স্ট্রীট)
ফোন ৯০৬২৮ ৫৬৯৮২

কূপমণ্ডূকের কলকাতা

ফ্রগওয়েল

ডুয়েল

—কুপো, সেদিন তুই বললি—যোগেন দাস বললেন,—ওয়ারেন হেস্টিংস এবং স্যার ফিলিপস্ ফ্রান্সিস পিস্তল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিলেন বেলভিডিয়ারে। সম্মান রক্ষার্থে ভদ্রলোকদের মধ্যে এই ডুয়েলের লড়াইয়ের চল ছিল ইংরেজ সমাজে। তারা লড়ত চৌদ্দ পা দূরত্ব থেকে। এই দূরত্বটা মাপত কে?

আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলাম। যোগেন দাসের প্রশ্ন শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হেসে বললাম,—দাদা, মধ্যযুগীয় এই বর্বর প্রথা তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি। মনে হয় ডুয়েল লড়বার কিছু নিয়ম-কানুন ছিল। দু'পক্ষেরই সমর্থক কেউ না কেউ সঙ্গে থাকত। কেউ আহত হলে তার চিকিৎসা করবার জন্যে ডাক্তারও থাকত। নিয়ম মেনে লড়াইটা হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্যে বিচারকও ছিল নিশ্চয়ই। বিচারকের নির্দেশ পেলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিঠোপিঠি দাঁড়াত, তারপর সাত পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই—

—দুম্!—পরিমল দত্ত বললেন। তিনি যোগেন দাসের সঙ্গে ছিলেন।

—এ তো ঠাণ্ডা মাথায় খুনের চেষ্টা!—যোগেন দাস বললেন,—এই ডুয়েল লড়া ছিল বিলেতের বিশিষ্ট মানুষদের ইজ্জৎ রক্ষার উপায়। গুলি লেগে হেস্টিংস মরে গেলে তো ভারতবর্ষের ইতিহাসই পাল্টে যেত।

—যেতই তো।—পরিমল দত্ত বললেন,—বিলেতে এই ডুয়েল লড়াই কি মাঝে মাঝেই লড়া হত? কোনো শাস্তি হত না লড়িয়েদের?

আমি হেসে বললাম,—আমি কলকাতার কূপমণ্ডূক দাদা, লালমুখোদের মুল্লুকের খবর রাখিনে।

—কলকাতায় ডুয়েল লড়াই আর হয়েছে কি!—পরিমল দত্ত প্রশ্ন করলেন। আমি একটু ভেবে নিয়ে আমার ডায়েরি বের করলাম ঝোলা থেকে।

—হয়েছে বৈকি। লালমুখোদের ইজ্জৎ বাঁচানোর পন্থা সেসময় এটাই ছিল।—ডায়েরির একটা পৃষ্ঠা খুলে বললাম,—এই যে, পেয়ে গেছি। ম্যাকফারসন সাহেব—স্যার জন ম্যাকফারসন ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল। তিনি ডুয়েল লড়েছিলেন লেফটেন্যান্ট হোয়াইটের বিরুদ্ধে। সে লড়াইতে

আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট হোয়াইটের মৃত্যু হয়েছিল।

—অ্যাঁ! মারা গিয়েছিল?—যোগেন দাস বললেন বিস্ময় প্রকাশ করে,—ম্যাকফারসনের কোনো শাস্তি হয়নি?

—না। তিনি তার পরেই গভর্ণর জেনারেল হয়েছিলেন। তাঁর পর এই দায়িত্ব পান লর্ড কর্ণওয়ালিস। নিজের ইজ্জৎ রক্ষা করতে প্রতিপক্ষকে সম্মুখ সমরে চ্যালেঞ্জ কোনো অপরাধ বলে গণ্য হত না সেসময় লালমুখোদের সমাজে, বোঝাই যাচ্ছে।

—পাঁচজনের সামনে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ানো, আদালতে পাঁচ বছর মানহানির মামলা—এসবের কোনো বালাই ছিল না। লোকগুলো খুব ডাকাবুকো ছিল, মানতেই হবে।—পরিমল দত্ত বললেন,—ইজ্জৎ বাঁচাবার এই রীতি এখন চালু থাকলে অনেক লোক মারা পড়ত।

—রীতিমতো সংযত হয়ে কথা বলতে হত, পাছে কারুর মানহানি হয়।—যোগেন দাস যোগান দিলেন।

আমি ডায়েরির আরেক পৃষ্ঠা খুলে বললাম,—এই যে, ১৮১০ সালের মে মাসে হাওড়ায় ফ্যার্থন জাহাজের দুই নাবিক ডুয়েল লড়েছিল রীতিমাফিক। তিনবার গুলি ছোঁড়ার পরও কেউ আহত হয়নি। পরের বছর দুই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থী রবিনসন ও কেনেডির মধ্যে ডুয়েল হয়। এবং এজন্যে রবিনসনকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হয়। ১৮২২ সালে দেখতে পাচ্ছি ডুয়েল লড়েছিলেন ডক্টর জেমসন ও মিস্টার বাকিংহাম। দু-দু'বার গুলি ছোঁড়া হলেও কেউ আহত হননি।

—ডুয়েলে কেউ আহত না হলে কি আবার লড়াই হত?—প্রশ্ন করলেন যোগেন দাস।

আমি মৃদু হেসে ডায়েরি ঝোলায় ঢুকিয়ে বললাম,—সেরকম হওয়ার কোনো খবর নেই। তবে বিবাদ আর বেশি দূর গড়াত না। ডুয়েল শেষ হবার পর লড়িয়েদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দিতেন তাঁদের সঙ্গীসাথীরা।

পরিমল দত্ত বললেন,—জানপ্রাণ কবুল করে ইজ্জৎ তো বাঁচানো হল, এরপর আর বিবাদ কিসের? যা কুপো, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা।

—আমি ভাবছি—যোগেন দাস বললেন,—সেসময় লালমুখোরা পকেটে পিস্তল নিয়ে ঘুরত। নিরাপত্তার কি এতই অভাব ছিল?

আমি মৃদু হেসে কোনো কথা না বলে হাঁটতে শুরু করলাম। ডুয়েল লড়িয়ে লোকগুলো ছিল বাঘা বাঘা, গভর্ণর জেনারেল, প্রশাসনিক অধিকর্তা। তাদের পকেটে আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার জন্যে পিস্তল থাকা স্বাভাবিক। আমি জানি না এভাবে প্ল্যান করে ডুয়েল লড়ে কোনো বাঙালি বা ভোজপুরীভাষী নিজের ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে কিনা।

রসকাব্য

শেষপাত

আমু

আমু আর তুই ছড়া কাটিস না,
পাঠকের সাথে ব্যথা বাঁটিস না,
যেথা জমায়েত ধান্দাবাজের
সেই পথ দিয়ে তুই হাঁটিস না।

কী হবে ছড়ায় ছড়িয়ে ছন্দে
উসকিয়ে দিয়ে মনে আনন্দে,
যদি না হয় তা আদৌ কাজের
ফারাক না গড়ে ভালো ও মন্দে?

বিষণ্ণ মনে বাড়ছে শঙ্কা—
সে হবে রাবণ যে যাবে লঙ্কা।
কাজ কি দেখিয়ে কোনটা ধাপ্পা?
তোর 'পরে সব নেতারা খাপ্পা—
ভালো চাস থাম, খাতার ভাঁজের
মাঝেই থাক না ছড়ারা চাপ্পা।

বনগাঁ লোকালের ভূত

গল্প

তপতী মিত্র

অঙ্কন সন্দীপ দেবনাথ

হাবু লোকটা নামেও যেমন, কাজেও তেমনি অপদার্থ। ফলে তার লেখাপড়া তো হলই না, শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তাকে আর কেউ কাজ দিতেও চায় না। কেননা সে যে কাজে হাত লাগায় তাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। সবাই ওর মাকে পরামর্শ দিল—ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

তাই হল। বিয়ের পরদিন হাবু বৌকে বলল,—ভাত রেঁধে দাও, খিদে পেয়েছে।

বৌ বলল,—টাকা রোজগার করে চাল ডাল সব কিনে আনো, রেঁধে দিচ্ছি।

হাবু বলল,—আমি তো কোনো কাজ পারি না। শুধু খেতে পারি।

বৌ বলল,—তবে দড়ি-কলসি জুটিয়ে মরোগে যাও।

হাবু খানিক ভেবে বলল,—দড়ি-কলসি কি হবে? আমি তো সাঁতারই জানি না।

বৌ দাঁত খিঁচিয়ে বলল,—তবে ডুবেই মরোগে। আমি বিধবা হয়ে বাঁচি। খালি হাতে বাড়ি ঢুকেছ কি, ঝাঁটাপেটা করব—মনে থাকে যেন।

আসলে সে ভেবেছিল এতে হাবুর মতিগতি ফিরবে। সে কাজকর্মের চেষ্টা করবে। কিন্তু যে হাবু সেই হাবুই। সে চলল ডুবে মরার জন্যে একটা পুকুরের খোঁজে। সে তো জানতই না তাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় সব পুকুরই ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে ট্রামডিপোর সামনে এল। ভাবল, তবে কি ট্রামে চাপা পড়বে? কিন্তু সে ভারি বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হবে। মুখটা থেঁতলে যাবে। কেউ চিনতেই পারবে না। তারপর সে দেখল, তাই তো, উল্টোদিকেই তো মেট্রো স্টেশন। পকেট হাতড়ে ঠিক চারটে টাকাই বেরুল। ব্যস, একটা টিকিট কেটে সে ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে।

তখন অফিস টাইম। প্ল্যাটফর্মে লোক গিজ্‌গিজ্ করছে। গাড়ি ঢুকছে। সকলের চোখ সেই দিকে। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই এক আহম্মক ঝাঁপ দিল রেল লাইনে। আর সঙ্গে সঙ্গেই অক্কা! চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেল। যাত্রী বোঝাই ট্রেনটা থেমে রইল ঐখানেই।

এদিকে হাবু অপঘাতের মড়া। সে তো ভূত হবেই। কিন্তু সে ভয়ে চোখ খুলছে না। ভাবছে সত্যি মরেছে তো? নইলে যে পুলিশ ধরবে, হাতকড়া লাগিয়ে হাজতে নিয়ে পুরবে। কিছুক্ষণ বাদে চোখ খুলে দেখল তার লাশটা পড়ে আছে আর সে শূন্যে ভাসমান। শরীর নেই, তাই ভারও নেই। কি বিপদ! এখন নিচে নামবে কেমন করে? সিলিঙের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে সে তখন প্রাণপণে কড়ি-বরগা, ডিজিটাল ঘড়ি, টিভি ইত্যাদি হাতের কাছে যা পেল ধরে ধরে, তারপর দেওয়াল বেয়ে নামল প্ল্যাটফর্মে। এবার কোনো মতে পা ঘষটে ঘষটে গিয়ে দাঁড়াল ট্রেনটার সামনে। দরজা বন্ধ, তাতে কি? ভূত অনায়াসেই দরজা গলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কামরায় ঢুকেই কানে এল চারিদিক থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি। সব তাকেই উদ্দেশ্য করে। বেচারির ভারি দুঃখ হল। সারাজীবন গালমন্দ শুনে এসেছে। ভেবেছিল মরলে অন্তত তার জন্যে সবাই একটু শোক-টোক করবে, কাগজে নাম ছাপা হবে। তা কোথায় কি!

এমন সময় মাথায় প্রচণ্ড একখানা চাঁটি পড়ল। আর বিকট গলায় কে যেন বলে উঠল,—অ্যাইয়ো! এখানে কি করছিস? জানিস না এটা আমার আস্তানা?

সে চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখল এক ব্রহ্মদত্যি। সে নিজে ভূত, তাই অন্য ভূতেদের দেখতে পাচ্ছে। ব্রাহ্মণকে ভক্তি করতে হয়, এটা সে শিখেছিল। তাই গড় হয়ে প্রণাম করে বলল,—আজ্ঞে, ভুল হয়ে গেছে। তা আপনি তো বেলগাছে থাকেন, এখানে কেমন করে?

ব্রহ্মদত্যি উদাস ভাবে বলল,—সেসব দিন আর আছে? শ্যাওড়াগাছ, বেলগাছ—সব গাছই তো মানুষ কেটে সাফ করে ফেলেছে। এমনকি এতকালের ভুশুণ্ডির মাঠ, সেখানেও টাউনশিপ হয়ে গেছে। আমাদের ঠিকানা এখন রেলের কামরা। রোজই তো নতুন নতুন ট্রেন উদ্বোধন হচ্ছে। তাই এখানে মনে হয় কোনোদিনই স্থানাভাব হবে না।

বলে সে পা ঝুলিয়ে রডের ওপর বসল। হাবু খুব বিনীত ভাবে বলল,—তা আপনি যদি দয়া করে বলে দেন আমাকে কোথায় যেতে হবে, মানে এখানকার নিয়মকানুন তো ঠিক—

ব্রহ্মদত্যি তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল,—ও, নতুন আমদানি। ঝাঁপ দিয়েছিলি বুঝি? তাই ভাবি, এমন গালাগালির তুবড়ি ছুটছে কেন? দাঁড়া দেখাচ্ছি—বলে সে কট্‌মট্ করে চাইতেই ট্রেনের সব আলো নিভে গেল। যাত্রীরা অন্ধকারে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কয়েক সেকেন্ড বাদেই আলোগুলো ফের জ্বলে উঠল। দাঁত বের করে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে সে হাবুকে বলল,—কি, কেমন ভেল্কি দেখালাম? চেষ্টা কর, তুইও শিখে যাবি। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলি, তোর আস্তানা? দাঁড়া দেখি সার্চ করে।

—সার্চ!

—দেখিসনি, মানুষ ইন্টারনেট খুলে সার্চ করে? তা আমাদের ওসব যন্ত্র লাগে না। এখানে সোজাসুজি কারবার—টেলিপ্যাথি।—বলে সে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকার পর চোখ খুলে বলল,—পেয়েছি। তোর জন্যে একটা পোস্ট খালি হয়েছে। বনগাঁ লোকালের ভূতটা রেলে কাটা পড়ে মরেছে। এবার মানুষ হয়ে জন্মাবে। তুই এক্ষুণি চলে যা শেয়ালদা স্টেশন। আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে। দেরি করলে ফস্কে যেতে পারে।

—কি করে যাবে? মেট্রো তো বন্ধ। রাস্তায় জ্যাম—

ব্রহ্মদত্যি খ্যাক্ খ্যাক্ করে বিকট অট্টহাসি হাসল। তারপর বলল,—ওরে বোকা, তুই তো এখন ভূত। আমাদের দেহ নেই, আছে শুধু মন। চোখ বুঁজে ইচ্ছে কর, দেখবি ঠিক পৌঁছে যাবি। তবে হ্যাঁ, একটু প্র্যাক্টিস লাগবে।

হাবু প্রথমে অ্যায়সা জোরে ইচ্ছে করল যে একেবারে সটান বর্ধমান চলে গেল! পরের বারে হাওড়া। এমনি করে শেষটায় শেয়ালদা পৌঁছে দেখল বনগাঁ লোকাল ততক্ষণে ছেড়ে গেছে। খানিক ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর তার খেয়াল হল—সে তো ভূত। আর কি, চোখ বুঁজেই ধরে ফেলল চলন্ত গাড়িটাকে।

কিন্তু উঠেই তো তার চক্ষুস্থির! সেখানে জায়গা দখল করে আছে এক মস্তান ভূত। সে হাবুকে দেখেই মারমুখো হয়ে তেড়ে এল। হাবু বেগতিক দেখে পালাতে যাচ্ছে, এমন সময় ভূতটা আঁতকে উঠে একছুটে গিয়ে দরজা দিয়ে লাফ মারল। হাবু দেখল একটা পেত্নীর চোখের কোটর দিয়ে আগুন ঝরছে। খ্যান্‌খেনে গলায় সে বলল,—তবে রে মিনসে, ভেবেছিলি আমাকে খুন করে সুখে সংসার করবি! কেমন, দিয়েছি তো ঘাড়টা মটকে! এবার আমার হাত থেকে আর নিস্তার নেই তোর।—বলে সেও লাফ দিয়ে ছুটল তার পেছনে।

সেই থেকে হাবু বনগাঁ লোকালেই আছে। রাত-বিরেতে কতজন তাকে দেখে ভয়ে ভিরমি গেছে। এতে সে ভারি মজা পায়। ফের মরে মানুষ হবার বাসনা তার নেই। বরং মানুষদের ঘাড় মটকাবার সুযোগ খুঁজতেই এখন সে ব্যস্ত। ✂

ট্যারা চোখে

গ্যাস দিচ্ছেন!

আপনার মাসে ক'টা গ্যাস সিলিন্ডার লাগে? আইনত আপনি মাসে দুটোর বেশি বুক করতে পারেন না। কারণ প্রতি ডোমেস্টিক সিলিন্ডারে তেল কোম্পানি ভর্তুকি দিচ্ছে চারশ টাকা। সেই হিসেবে বিদেশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণতি কাউর ভর্তুকি পেয়েছেন ৬৪,০০০ টাকা, কেন না এ বছর জানুয়ারি থেকে মে—এই পাঁচ মাসে তিনি খরচ করেছেন ১৬১টি সিলিন্ডার। আরো অনেকেই চেষ্টা করেছেন তাঁর ধারেকাছে যেতে। যথা, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বহুগুণা ৮৩, কিংবা শিল্পপতি তথা সাংসদ নবীন জিন্দাল ৩৬৯। অবশ্য সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, ১৭১। এসব জানাজানি হতেই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জয়পাল রেড্ডি বলেছেন—না না, কোনো বিধি-নিষেধ নেই। যে যতগুলো খুশি সিলিন্ডার নিতে পারেন। যেটা বলেননি সেটা হল, নেতারা এত এত গ্যাস নিয়ে কী করেন? নেতারা তা পাবলিককে খাওয়ান। তাই খেয়েই তো আমাদের পেট ভরে যায়!

—সংঘমিত্রা কর

হীরক রাণীর দেশে

পীযূষকান্তি সেন

হীরকরাণী — শিক্ষামন্ত্রী, পণ্ডিতেরা কি কয়?
শিক্ষামন্ত্রী — আজ্ঞে রাণী, কিঞ্চিৎ পাচ্ছে ভয়!
হীরকরাণী — বেশ বেশ! কেমন চলে পাঠশালা?
শিক্ষামন্ত্রী — পড়াশুনা হয় দুই বেলা.........
হীরকরাণী — এ তো ভালো কথা নয়! অ্যাত্তো কেন পড়ে?
শিক্ষামন্ত্রী — জ্ঞানের ইচ্ছা ঘরে ঘরে।
হীরকরাণী — ই-স্-স্!! জ্ঞান যত বাড়বে
রাণীর বিরুদ্ধে কথা বলবে।
কি, ঠিক না বেঠিক?
সভাসদ্‌গণ : ঠিক ঠিক ঠিক।
হীরকরাণী — তবে বন্ধ হোক পাঠশালা!
শিক্ষামন্ত্রী — হতেই পারে; তবে একটু আছে জ্বালা।
হীরকরাণী — সে আবার কি?
কও দেখি!
শিক্ষামন্ত্রী — বেকার ছাত্র, খোলা পাখি......
হীরকরাণী — হুম্-ম্-ম্..আমার কাজে দেবে ফাঁকি?
বলো তবে উপায় কি।
শিক্ষামন্ত্রী — বেঁধে রাখা যায় না কি?
হীরকরাণী — শিকল দিয়ে? ঠিক আছে বাঁধো তবে।
শিক্ষামন্ত্রী — না-না, হবে একটু অন্য ভাবে।
হীরকরাণী — তাই বুঝি? বলো দেখি শুনি তবে...
শিক্ষামন্ত্রী — পাঠশালা থাক
শুধু পাশ-ফেল উঠে যাক।
হীরকরাণী — বলো কি? কাজ হবে?
সভাসদ্‌গণ : হতেই হবে......হতেই হবে.....
হীরকরাণী — বেশ, লেখো বয়ান তবে—

শোনো জনগণ—
কচি-কাঁচা যত আছে
পাঠশালা যাবে সবে,
খাবে-দাবে, খেলবে আর ঘুমাবে
পিতা-মাতার চাপ নাই,
ভাবনাও কিছু নাই,
আজ থেকে এ রাজ্যে
পাশ-ফেল নাই। ✂

আঁকা বা লেখা পাঠাবার উপযুক্ত জায়গা পাচ্ছেন না ? ভয় পাচ্ছেন, পাছে আপনাকে অসম্মান করে ?
তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে লেখা বা আঁকা পাঠাতে পারেন।
আমরা কাউকে সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে অসম্মান করি না।
পত্রপাঠ
ফোনে ফাটাফাটি করে নিন ৯৯০৩৬-২৪৯৯২ (সম্পাদোদক)

অঙ্কন সন্দীপ দেবনাথ

তালাক

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কচিগল্প

ডাঃ মকবুল হক প্রেসক্রিপশন লেখা কাগখানা হাতে নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়ানো মহিলাকে বললেন,—আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আসুন, বুঝে নিন ওষুধগুলো কখন কিভাবে খাওয়াতে হবে।

রোগী আফজল শেখ হাঁ হাঁ করে উঠে বসে হাত নেড়ে বলল,—ওকে ডাকবেন না ডাক্তারবাবু, ওর ঢোকা নিষেধ।

—নিষেধ! কেন?

আফজলের ছেলে গোলামঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল,—উনি আমার মা ডাক্তারবাবু। ফতিমা বিবি। আব্বা ওঁকে রোজই একবার করে তালাক দিচ্ছে।—মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলল আফজল,—আপনি জানেন না ডাক্তারবাবু, দজ্জাল মেয়েছেলে। আমি এতবার তালাক দিলাম, কিন্তু একবারও এ-বাড়ি ছাড়ার নাম করে না!—সে হাঁপাতে লাগল।

গোলাম গলা চড়াল এবার,—বাড়ি ছাড়বে কেন? এটা কি তোমার বাড়ি? এ বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সব আমার নামে লিখে দিয়ে গেছেন দাদাজান। আমার মা আমার বাড়িতে থাকবে।

—সে থাকে থাকুক, কিন্তু আমার ঘরে ঢুকবে না।—আফজল শুয়ে পড়ল আবার।

ডাক্তারবাবু গোলামকে প্রশ্ন করলেন গম্ভীর ভাবে,—এই তালাকের ব্যাপারটা কতদিন ধরে চলছে?

—তা প্রায় বছর দেড়েক। দাদাজান তখনো বেঁচে ছিলেন। আব্বার জীবনযাত্রার ধরণ-ধারণ, আচার-আচরণ, কথাবার্তা—এসব নিয়ে রোজ খিটিমিটি বাধত মায়ের সঙ্গে। হঠাৎ একদিন আব্বা বলে বসল মাকে—যা তোকে আমি তালাক দিলাম। ভাগ্ এ বাড়ি থেকে!

গোলাম একটু থামল, তাকাল আফজলের দিকে, তারপর আবার বলল,—দাদাজানের কানে গেল কথাটা। তিনি ক্ষেপে গিয়ে বললেন,—তোর এতবড় সাহস, তুই আমার মাকে তালাক দিস!! কুলাঙ্গার! বেরিয়ে যা তুই! দাদাজান উকিল ডেকে বিষয়-সম্পত্তি সব আমার নামে লিখে দিলেন কিছুদিনের মধ্যেই। এবং তার মাসখানেক পরেই এন্তেকাল হল তাঁর।

আফজল ক্ষীণ কণ্ঠে চিৎকার করল,—ওর কথা বিশ্বাস করবেন না ডাক্তারবাবু। ওরা মায়ে-পোয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে.....কাসির দমকে তার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজার ওপাশ থেকে ফতিমা বলল,—ওসব কথা এখন থাক, তুই বুঝে নে কোন ওষুধটা কখন খাওয়াতে হবে, কী পথ্যি পড়বে।

আফজল করুণ কণ্ঠে বলল,—আমাকে ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু, আমি আর পারছি না।

ডাক্তার হক বললেন,—ওষুধ যে দেব, শুশ্রূষা করবে কে? সময়মতো ওষুধপথ্য দেবার লোকটা কোথায়? আপনি তো আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষটাকে তালাক দিয়ে বসে আছেন, ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে দিচ্ছেন না।

গোলাম বলল,—তাতে কোনো অসুবিধে হবে না ডাক্তারবাবু। আমার মা-ই সবকিছু করে। শুধুএই ঘরের কাজগুলো অন্য লোক দিয়ে করায়। আব্বার ওপর দিনরাত নজর রাখে সে।

ডাক্তার হক নাটকীয় ভাবে হাতের প্রেসক্রিপশনটাকে ছিঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—এইরকম রগচটা বেয়াদব রোগীর চিকিৎসা আমি করি না।—তিনি তাঁর ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

ডাক্তারবাবু বাইরে বেরোতেই ফতিমা বিবি তাঁর পথরোধ করে অপরাধীর মতো মাথা নত করে দাঁড়াল। গোলাম অনুনয় করল,—ডাক্তারবাবু, আব্বা বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে, আপনার ওষুধ না পেলে বাঁচবে না।

—যে লোক এক বৌকে দিনে দশবার করে তালাক দেয় তার চিকিৎসা আমি করব না।—ডাক্তার হক বললেন,—তুমি আমার সঙ্গে চেম্বারে এসো।

ঘরের ভেতর থেকে আফজলের কাতর কণ্ঠ শোনা গেল,—অ্যাই, ডাক্তারবাবুকে আটকা....আমার ওষুধ....

ফতিমা বিবি আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল। ডাক্তারবাবু পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন। গোলামকে বললেন বেশ চড়া গলায়,—যাও, গিয়ে জেনে এসো, নিজের বৌকে নাহয় তালাক দিয়েছে, কিন্তু গোলামের মা সেবা-শুশ্রূষা করলে তোমার আব্বার আপত্তি আছে কিনা।

গোলাম ছুটে ঘরে গেল এবং একটু পরে বেরিয়ে এল।

—আব্বার আপত্তি নেই ডাক্তারবাবু।

—বেশ, তবে চলো আমার সঙ্গে, আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।—ডাক্তারবাবু হাঁটা শুরু করলেন।

সেবা করার জন্যে ঘরে ঢোকার ছাড়পত্র অবশেষে পেল গোলামের মা ফতিমা বিবি। নিজেকে সে উজাড় করে দিল। তালাক শব্দটা কয়েকবার মুখে এনেছিল আফজল, কিন্তু উচ্চারণ করেনি। সুবোধ রোগীর মতো ফতিমার নির্দেশ পালন করল সে।

সাতদিন পর এলেন ডাক্তার হক রোগীর অবস্থা দেখে খুশি হলেন তিনি। বললেন,—যাক, অনেক সুস্থ আছেন। গোলামের মাকে আবার তালাক দিয়ে বসেননি তো?

মুখে আঁচল চাপা দিল ফতিমা। আফজল কথাটা শুনেই জিভ কাটল। সে বলল,—ছি ছি, না না, ও-কথা কি আমি আর একবারও উচ্চারণ করি! খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

গোলাম রিপোর্ট করল,—আব্বাকে যা বলা হয়েছে তাই করেছে সে বিনা মন্তব্যে বা প্রতিবাদে। মায়ের সঙ্গে কথাও বলেছে হেসে হেসে।

আফজল শেখ তৃপ্ত কণ্ঠে বলল,—যাই বলুন ডাক্তারবাবু, দেখলাম সেবা-শুশ্রূষার কাজে গোলামের মায়ের জুড়ি নেই। ও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এ যাত্রা। ও না থাকলে আমি হয়ত মরেই যেতাম।

পত্রপাঠ আড্ডার কয়েকজন

আড্ডাকথন

অমিত গঙ্গোপাধ্যায়

পত্রপাঠের পাতায় (মে,২০১২) আমার একটা বিরস রচনা বেরিয়েছিল—'কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও।' বৌ পেটানোর সমর্থনে দু'লাইন লিখেছিলাম আর কি! ব্যস্, তার কয়েক দিন পরেই কে বা কারা যে আমার ভালো হাতটা দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে চলে গেল! টের পাই নি, কেন না ঘুমোচ্ছিলাম। তাই, আপাতত হাতে প্লাস্টার বেঁধে বসে আছি আর সাতপাঁচ ভাবছি!

দু'দুটো পত্রপাঠ আড্ডা মিস্ করলাম। আড্ডার বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে। প্রথমেই মনে পড়ছে সুবোধচন্দ্র পাল আর অসিত গুহ'র কথা। এঁরা দুজন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। মানে জিগ্‌রি দোস্ত্ আর কি! কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হয় না। সারাক্ষণ দু'জন দু'জনকে লেগ পুলিং করে যান। সুবোধবাবু ঢাকার বাঙাল। এখনো ঢাকায় যাওয়া-আসা করেন। তবে ঘটিদের ভাষা ভালোই রপ্ত করে ফেলেছেন। তিনি যখন পত্রপাঠে লেখা শুরু করলেন, তাঁর স্ত্রী কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না যে ওগুলো সুবোধবাবুর লেখা। সত্যিই তো, কত সুবোধ পাল-ই তো থাকতে পারে না বাজারে! লেখক সুবোধ পাল যে তাঁর স্বামী তার প্রমাণ কি? অনেক চেষ্টা করেও যখন তিনি স্ত্রীর বিশ্বাস অর্জন করতে পারলেন না, তখন তাঁর মাথায় অন্য প্ল্যান এল। নিজের বাড়িতেই পত্রপাঠের আড্ডা ডেকে বসলেন। আমরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে দেখলাম এলাহি আয়োজন খাবার-দাবারের। মনে মনে ভাবলাম, দিল্ হ্যায় তো 'অ্যায়সা! তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত যত্ন সহকারে খাবার-দাবারগুলো সাজিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে দিলেন। পরের শুক্রবারে সুবোধবাবু পত্রপাঠ আড্ডায় এলেন একগাল হাসি নিয়ে। বললেন,—"কিছুডা হইছে।" জিজ্ঞেস করলাম,— কি হয়েছে? বললেন—অখন কিছুডা বিশ্বাস হইছে।

পুরোপুরি বিশ্বাস অর্জনের আশায় আবার নিজের বাড়িতে পত্রপাঠের আসর বসালেন। অর্থাৎ রিপিট নেমন্তন্ন করলেন আমাদের। অবশেষে নিজের স্ত্রীর কাছে লেখকের স্বীকৃতি আদায় করে তবেই ছাড়লেন সুবোধবাবু।

সুবোধবাবুর লেখা প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রস্মিতার কথা বলতে হয়। প্রস্মিতা সুবোধবাবুর নাতনি। বইমেলা প্রাঙ্গণে আমরা, অর্থাৎ সুবোধবাবু, অসিতবাবু ও আমি তার গান শুনেছি 'ফকিরা' বাংলা ব্যান্ডের অনুষ্ঠানে। কণ্ঠস্বরে তার আশ্চর্য প্রতিভা। এই প্রতিভার পরিপূর্ণ উন্মেষ হোক, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, এই কামনা আমাদের।

সম্প্রতি সুবোধবাবুর একাধিক(?) দন্তপতন হলেও দাঁত বসাতে বড্ড দেরি করছেন। কিংবা উনি কি দ্বিতীয় শৈশব-কে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন? হাসলে ওনাকে শিশুর মতোই দেখায়। ইদানীং ব্যবহারেও শিশুর সারল্য ফুটে উঠছে। খাওয়া-দাওয়াও করছেন শিশুর মতো। পত্রপাঠের আসরে তেলেভাজা-র বদলে বিস্কুট খান।

এহেন সুবোধবাবু অসিতবাবুর বন্ধু। এমনই বন্ধু যে দু'জনের মধ্যে সবসময় খিটিমিটি লেগেই আছে। সেকেলে গানের একটা লাইন উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করছে,—'এমন বন্ধু আর কে আছে?' তবে দু'জনের এক জায়গায় মিল আছে বৈকি! দু'জনের বয়েসের গাছ-পাথর না থাকলেও মন কিন্তু রসসিক্ত, মানে, রসে মাখামাখি আর কি!

অসিতবাবু সাহেবি স্টাইলে ইংরেজি বলেন। আদব-কায়দার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা বনেদিয়ানা উঁকি মারে। তাঁর জ্ঞানের এ-কূল ও-কূল নেই। না, এটা কোন লেগ পুলিং নয়। বাস্তব কথা। তাঁর স্মৃতি প্রখর। যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারেন। যে কোনো বিতর্কিত আলোচনা শুরু করতে পারেন, শেষও করতে পারেন। জোরে, দাবিয়ে কথা বলতে জানেন। গলায় ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগানোর ব্যবস্থা থাকলে আমরা ওঁর বিবাহ বার্ষিকী-তে সেটা উপহার দিতাম। অন্তত ওঁর গিন্নি খুব খুশি হতেন। যাই হোক, এই দুই বন্ধু না এলে পত্রপাঠ আড্ডা পান্‌সে হয়ে যায়। তাই, পত্রপাঠ আড্ডায় যাবার আগে সম্পাদোদক মশাইকে ফোন করে জেনে নিই—আজকে কে কে আসছেন? অর্থাৎ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করি—সুবোধবাবু আর অসিতবাবু আসছেন তো?

পেশায় ইঞ্জিনীয়ার পিনাকীবাবু হাট্টা-কাট্টা মানুষ। কেউ হাসালে মুচকি হাসেন। ফলে, তাঁর দাঁত আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। কিংবা তাঁর দাঁত আদৌ আছে কি না জানতে পারলাম না।

এর পরে মনে পড়ছে সেই দু'জনকে, যাঁরা বেহালা পার করে মহেশতলা যাবার পথে কেঠো-পোলের কাছে ভাগাড়ের পাশে শকুনতলায় থাকেন। পোশাকি নাম শকুন্তলা পার্ক। একজন পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী, অন্যজন সংঘমিত্রা। "সংঘমিত্রা কর" বলতে পারলাম না। কারণ, কাউকে চট্ করে তুই-তোকারি করতে পারি না যে! একবার পিনাকীবাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর বাড়ি। আমরা পত্রপাঠ-পার্টি হাড়-হাভাতের মতো পৌঁছে গেলাম তাঁর সেখানে। গিয়ে বুঝলাম, পাড়ায় পিনাকীবাবুর যা প্রতিপত্তি, তাতে প্রত্যেক হাড়-হাভাতের দু-চারটে করে হাড় অনায়াসে ভেঙে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। এজন্যে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার পিনাকীবাবু হাট্টা-কাট্টা মানুষ। কেউ হাসালে মুচকি হাসেন। ফলে, তাঁর দাঁত আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। কিংবা তাঁর দাঁত আদৌ আছে কি না জানতে পারলাম না। তবে তিনি ইংরেজি শব্দ misno-

আঁকা বা লেখা পাঠাবার উপযুক্ত জায়গা পাচ্ছেন না? ভয় পাচ্ছেন, পাছে আপনাকে অসম্মান করে?
তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে লেখা বা আঁকা পাঠাতে পারেন।
আমরা কাউকে সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে অসম্মান করি না।
ফোনে ফাটাফাটি করে নিন ৯৯০৩৬-২৪৯৯২ (সম্পাদোদক)
পত্রপাঠ

mer-এর জীবন্ত নিদর্শন। তাঁর চেহারা আর লেখার মধ্যে কোনো মিল নেই। তাঁর 'মারায়ণ' পড়তে পড়তে অনেকের মতো একদিন তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু আমি কেন, 'মারায়ণ' পড়লে স্বয়ং নারায়ণ-ও তাঁর ফ্যান হতে বাধ্য। তবে এখন আমি আর তাঁর ফ্যান নই। কারণটা একটু পরে বলছি।

তাঁর ছড়া, গল্প, রম্যরচনায় ঠাসা থাকে ফাটাফাটি হাসি। ভাবা যায় না। ইঞ্জিনীয়ারের হাত থেকে এত রস বেরোয় কি করে? যে-কোনো সাবজেক্ট দিয়ে ওঁকে কাগজ-কলম হাতে বসিয়ে দিন, সে 'জুতো'-ই হোক, 'বাথরুম'-ই হোক বা ইট, পাথর, হাঁড়ি-কড়াই, যে কোন হাবি-জাবি বিষয় হোক। দেখবেন, আধঘন্টার মধ্যেই তাঁর কলম থেকে রস গড়াচ্ছে। সে যাই হোক, আমি আর পিনাকীবাবুর ভক্ত নই। একদিন জানতে পারলাম আমার স্ত্রী 'পত্রপাঠ' পত্রিকায় শুধু পিনাকীবাবুর লেখাই পড়েন। আমার লেখা তো ভুল করেও পড়েন না। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্রী। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আমার সেহেন স্ত্রীকে দেখলাম, পিনাকীবাবুর লেখা গোগ্রাসে গিলছেন। সেদিন মনে হল, ভদ্রলোক তো মোটেই সুবিধের নয়। খুব ডেঞ্জারাস। যে কোনো বাড়ির অন্দরমহলে ছুঁচ হয়ে ঢুকে পড়ার ক্ষমতা রাখেন! এমন লোকের ভক্ত হওয়া খুব রিস্কি! পিনাকীবাবুর আসল নাম 'রসপাষণ্ড'। ডাকনাম পিনাকী। এই ঘটনার পরে আমি পত্রপাঠ আড্ডায় একদিন তাঁকে সরাসরি আক্রমণ করলাম,—হে রসপাষণ্ড ষণ্ড, এই একান্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার লণ্ডভণ্ড কাণ্ডের জন্য মুণ্ড ও গণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব। শুনে তিনি হাসলেনও না, রাগও করলেন না। মানে, আমকে হ্যাটা করে দিলেন।

ইনি সেই তরুণ, চট্‌জলদি মুখে মুখে বানানো ফণীমনসার ছড়ায় দীপ্তেন সান্যাল যাঁকে অমর করে রেখেছেন—"চক্রাচার্য সুবল ছোঁড়া/ জাত কেউটে, নয়কো ঢোঁড়া" ...ইনিই সুবল চক্রাচার্য।

সংঘমিত্রা সু-সাহিত্যিক। উইট, হিউমার আর স্যাটায়ার সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত ('সিদ্ধহস্তা' শব্দ আবার হয় নাকি!)। ছড়া, গল্প, সেই সাথে নিয়মিত কলম 'ট্যারা চোখে', 'আগাম খবর', 'রসচর্চা' ইত্যাদি লিখে তিনি পত্রপাঠের অনেক পাতা জুড়ে বিরাজ করেন। তবে সংঘমিত্রা নারীবাদী। আমাদের মত শৌখীন নারীবাদী নন, রীতিমতো সিরীয়াস। একমাত্র উনিই টেলিফোন করে আমার খোঁজখবর নিয়েছেন আর উপদেশ দিয়েছেন—কেন লেখেন ঐসব কথা? বৌ-পেটানো আমাদের অধিকার, কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও,—এখন নিজের হাতটা গেল তো? আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিই—ভাগ্যিস্ ডানহাতটা গেছে। বাঁহাতটা গেলে সব্বনাশ হয়ে যেত। আমদানির চান্স বন্ধ হয়ে যেত।

সংঘমিত্রা ঝগড়ুটে। এ কথা যেন সংঘমিত্রার কানে না যায়। তাহলে হয়ত একটা পা-ও চলে যেতে পারে। উনি সায়েন্স পড়েছেন। আর্টস পড়া ছেলে-মেয়েরা ঝগড়া করতে গিয়ে আবেগ আর সেন্টিমেন্টের শিকার হয়ে কেমন যেন ল্যাজে-গোবরে হয়ে যায়। বিজ্ঞান পড়া লোকেরা যুক্তিজাল বিস্তার করে অপর পক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। ফলে এটা সংঘমিত্রার গুণ। অনেক গুণই তাঁর আছে। তবু পত্রপাঠ আড্ডায় এসে তাঁকে টুল-এ বসতে হয়। পত্রপাঠ অফিসে চেয়ারের সংখ্যা সীমিত। ফলে লেট লতিফরা টুলে বসেন।

এরপর যাঁর কথা না বললে নয়, তিনি হলেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য। দীপ্তেন সান্যালের অচলপত্রের পাতায় লিখতেন। ইনি সেই তরুণ, চট্‌জলদি মুখে মুখে বানানো ফণীমনসার ছড়ায় দীপ্তেন সান্যাল যাঁকে অমর করে রেখেছেন—"চক্রাচার্য সুবল ছোঁড়া/ জাত কেউটে, নয়কো ঢোঁড়া".....ইনিই সুবল চক্রাচার্য। অচলপত্রের পাতায় তাঁর আরো খান দুই নাম ছিল। এইরকম লেখক আজকাল বিরল। পেশায় শিক্ষক। শান্ত, নম্র, ভদ্র, ম্যাচিওরড্। আড্ডায় এসে যেটুকু বলেন, তার চারগুণ শোনেন। সময়মতো আসেন, সময়মতো উঠে দাঁড়ান। আমার বা আমার মতো দু'একজনের ছ্যাবলামি বা বাচালতা নীরবে সহ্য করেন। অর্থাৎ কটু কথা (কু) বলেন না, কিন্তু 'কু' শোনেন, 'কু' দেখেন। একটি অনুকরণযোগ্য চরিত্র। তিনি হাস্যরসিক কিন্তু সিরীয়াস। অসাধারণ গল্প ও রম্যরচনা উপহার দেন। এহেন এক সিরীয়াস হাস্যরসিক যেদিন আড্ডায় অনুপস্থিত থাকেন, সেদিন আড্ডার পরিবেশ কেমন যেন ম্যাড়্‌মেড়ে হয়ে যায়।

সবার শেষে কঠিন কাজটা করা যাক। বস্-কে নিয়ে রসিকতা করা আর খোলা বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত ধাতুরূপ মুখস্থ বলা একই ব্যাপার। আমাদের বস্ শেখর আহমেদ। শেখর আহমেদের যা চেহারা এবং কণ্ঠস্বর তাতে উনি সিনেমায় অভিনয় চালিয়ে গেলে অনেক হীরো জিরো হয়ে যেত। অধ্যাপক শেখর আহমেদ ছাত্রপাঠ্য বই বা মেডইজি লিখে বড়লোক হতে পারতেন। পত্রিকা প্রকাশের পাগলামি ছেড়ে নিজের লেখা চালিয়ে গেলে কবে সেলিব্রিটি হয়ে যেতেন! এসব না করে তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন। কবি বলেছেন—পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি। কবি তো শুধু বলেছেন। আর শেখর আহমেদ কবির কথায় উজ্জীবিত হয়ে প্রায় ১৪৪(১২X১২ =১৪৪) খানা পত্রপাঠ সম্পাদনা করে আয়ুক্ষয় করে ফেললেন। ফলে সিনেমায় হীরো হবার চান্স তো ফস্‌কে গেলই, এমনকি পাড়ার হীরো হবার সুযোগটাও হারালেন। কেননা, উনি কিছুদিন আগে পাড়া বদল করেছেন। অবশ্য বড়লোক হবার আর সেলিব্রিটি হবার স্বপ্ন তাঁর চোখে না থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হবার আগে আরো কতগুলো পত্রপাঠ ছাপতে হবে?

মুড্ ভালো থাকলে তিনি গুণগুণ করে সুর ভাঁজেন। সেই সুর বিরহের, না মিলনের তা বোঝার আগেই থেমে যায়। মুড্ খারাপ থাকলে তিনি কম্প্যুটার নিয়ে খুট্ খাট্ করতে থাকেন। তবে মাঝে মাঝে হাসির কথা উঠলে তিনি হাসেন।

পত্রপাঠ আড্ডার মেনু তেলেভাজা, মুড়ি আর ভাঁড়ের চা। শেখর আহমেদ নিজহাতে এ সব জোগাড়-যন্তর করেন। আমরা নির্লজ্জের মতো বসে থাকি। তবু সংঘমিত্রার একটু চক্ষুলজ্জা আছে। তিনি মাটির ভাঁড়ে শেখর আহমেদকে চা ঢালতে সাহায্য করেন। আমরাও যে সাহায্য করি না তা নয়। তবে সেটা চা-মুড়ি-তেলেভাজাকে দ্রুত ভ্যানিশ করে দিয়ে।

পত্রপাঠ অফিসে ঢুকতে গেলে চটি খুলে বাইরে রেখে আসার নিয়ম চালু আছে। তবু আজ পর্যন্ত করো চটি (এক পাটি বা দু'পাটি) চুরি হয়নি। তার মানে এই নয় যে ফার্ণ রোডে কোনো জুতোচোর নেই। আসলে চটিগুলো চুরির অযোগ্য। চোরেদেরও তো একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে!

অন্য বন্ধুদের কথাও মনে পড়ছে। তবে আমার ভাঙা হাতটাও বিট্রে করে যাচ্ছে সমানে। ভবিষ্যতে তাঁদের নিয়ে লেখার ইচ্ছে রইল। আসলে, কলকাতা শহরে অম্লজান বা অক্সিজেনের বড় অভাব। দিন দিন এই অভাব বাড়ছে। জলাশয় বুঁজিয়ে ফেলা হচ্ছে, গাছপালা কমে যাচ্ছে, লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমরা অক্সিজেনের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে পত্রপাঠ আড্ডায় এসে ভিড়ে গেছি। সপ্তায় একবার (শুক্রবার) কয়েক ঘণ্টা বুকে অক্সিজেন পুরে আমরা চাঙ্গা হয়ে বাড়ি ফিরে যাই। আর অপেক্ষায় থাকি পরের শুক্রবারের জন্যে।

অক্সিজেনের অভাব হলে এখানে ঢুঁ মারার কথা ভাবতে পারেন। এখানে, আমাদেরকে নয় কিন্তু।

রসরচনা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন প্রণব হোড়

প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চলা আমাদের পকেটমার ট্রেনিং স্কুলে অগাস্ট সেশনের জন্য ভর্তি চলছে। আমাদের কোর্সের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত সজাগ শিকারেরও অজান্তে তার মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ইত্যাদি তুলে নেওয়া। অমাদের স্কুলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঠেকদার মিস্ত্রিরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ফিল্ডে কাজ করে চলেছে। তাদের ইনকাম ঈর্ষণীয়। আমাদের শিক্ষাক্রমে নতুন শিক্ষার্থীদের ধরা পড়লে মার খাওয়া কিভাবে হজম করতে হয় তাও শেখানো হয়। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা প্রথম দু'একটা কেসে ধরা পড়ুক। তাহলে, ধরা পড়ে কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হয়ে যায়। থানায় গেলে কী ধরণের ব্যবহার তারা পাবে, স্পেশাল কনস্টেবলরা—কিভাবে লাইনে টিকে থাকতে হবে, সেটাও জানাবে এবং প্রতিটি কেসে ধরা না পড়লেও তাদের প্রণামী কিভাবে পৌঁছে দিতে হবে, তাও বলে দেবে।

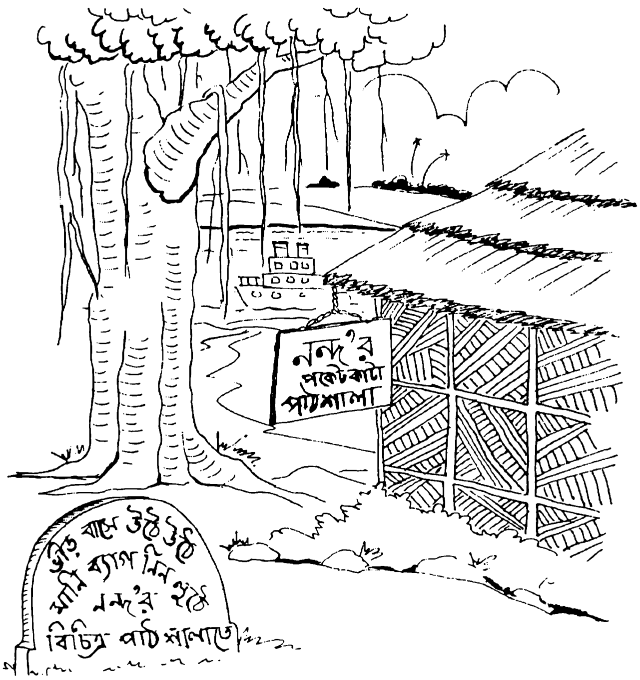

দু-একবার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার জন্যে আমাদের ফ্যাকাল্টিরা ট্রেনীদের নিয়ে ভীড় বাসে উঠে শিকার চিনিয়ে দেবে এবং কিভাবে অপারেশন চালাতে হবে, কেমন করে চলন্ত বাস থেকে নামতে হবে, তারপর, ভিড়ে মিশে যাওয়া, এবং কখন শিকারকেই 'পকেটমার' বলে মারতে মারতে বাস থেকে নামিয়ে নিজেদের পালাতে হবে, সব শিক্ষা দিয়ে দেন।

আমাদের শিক্ষকরা বউবাজারের পোড়খাওয়া পকেটমার, কলকাতার বিভিন্ন থানা এবং লালবাজারের পুরনো অফিসার এবং সিপাইদের পরিচিত এবং বিশেষ আস্থাভাজন। কখনো বড় কাজ হলে তাঁদের বঞ্চিত করেন না, প্রণামী যথাসময়ে, যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করেছেন।

কোনো দ্বিধা, সংশয়, লজ্জা বা ভয় মনে না রেখে অবিলম্বে আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়ে যান। মনে রাখবেন, ঈশ্বর দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেছেন—একদলের 'আছে' আর অন্য দলের 'নেই'। যাদের আছে তাদের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ, মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে নেওয়া মোটেই অন্যায় বা পাপ নয়। ওগুলো সমাজের পাজি লোকেদের শেখানো বুলি। দেখুন না ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে পৃথিবীতে এনেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক মশাদেরও পাঠিয়েছেন। কেন? মানুষের রক্ত আছে, আর মশাদের রয়েছে টাটকা শোণিতের পিপাসা। সে তো মানুষের শরীরে বসে হুল ফুটিয়ে তার তৃষ্ণা মেটাবে, এবার মানুষ পারলে মশার হাত (হুল) থেকে বাঁচার চেষ্টা করুক। এটা তো ভগবানেরই ইচ্ছে। আমরা হচ্ছি এই মশা, যার রয়েছে অর্থের সীমাহীন খিদে। যাদের আছে প্রচুর টাকা-পয়সা, তাদের ভার আমরা লাঘব করে দিই। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? এ তো প্রকৃতিরই নিয়ম। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এই ইচ্ছেটাই প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আর চিন্তা না করে ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, প্রফেসার, এম.বি.এ-র মতো পকেটমারাটাও একটা নোবেল প্রফেশান হিসেবে গ্রহণ করুন।

শিক্ষা দেবার জন্যে আমরা রয়েছি। মাত্র তিন মাসের কোর্স, এর মধ্যে দু-সপ্তাহ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হবে, শিয়ালদা-বনগাঁ লোকালে অফিস টাইমে বিশেষ শিক্ষণ দেওয়া হবে তিনদিনের জন্যে।

কোর্স ফী মাত্র বারো হাজার টাকা। যে বিপুল টাকা আপনি উপার্জন করবেন তার তুলনায় এটি যৎসামান্য। ইনস্টলমেন্টেও দেবার ব্যবস্থা আছে। তবে, সর্বাধিক তিনটি কিস্তিতে দিতে হবে। শিক্ষান্তে ১০০ ভাগ সহযোগিতা করা হয় প্লেসমেন্টের জন্যে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও প্রাপ্ত মার্কস অনুযায়ী তাদের প্লেস করা হয়। বড়বাজার এলাকায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ট্রেনীদের দেওয়া হয়। এ ছাড়া লোকাল ট্রেন, লঞ্চ, ভীড় বাসে আমাদের স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা কাজ করে। শুধু মেট্রো রেলটা আমরা এখনো সমীক্ষার স্তরে রেখেছি। কিভাবে অপারেশন সেরে সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে আসা যায়, সে বিষয়ে আমরা ভাবনা-চিন্তা এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পারামর্শ করছি। প্রয়োজনে দিল্লীর অভিজ্ঞ পকেটমারদের সহায্য নেব আমরা।

সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের জানাই, আমাদের স্কুলে বর্তমানে বেনারস, এলাহাবাদ, পাটনা ও শিলিগুড়ির বেশ কিছু ছাত্র রয়েছেন। যাঁরা আসন্ন পুজোর মরসুমে কাজে নামতে চান, তাঁরা অবিলম্বে আমাদের হেড অফিসে যোগাযোগ করুন। ঠিকানা—লঞ্চঘাট দিয়ে উঠে বটগাছের ডানদিকের রাস্তায় কচিরামের বিড়ির দোকানের পাশের গলি দিয়ে কিছুটা যাবার পরই দরমায় ঘেরা বড় চালাঘর।

প্রথম একশজন আবেদনকারী, যাঁরা পুরো কোর্স ফী জমা দেবেন তাঁদের একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হবে। এটি পরে ভীষণ কাজে লাগবে। আর চিন্তা-ভাবনা না করে অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন।

তবে আমাদের নকল করে অনেক ছুটকো স্কুল গজিয়ে উঠেছে। কারুর কথায় কান না দিয়ে সোজা নন্দর স্কুলে চলে আসবেন।

মনে রাখবেন নামটা, 'নন্দ'।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

(খবরের কাগজের সৌজন্যে)

অঙ্কন প্রণব হোড়

রঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজারে আনন্দ ছড়িয়ে আছে, খুঁজে-পেতে নিতে হয়। সাম্প্রতিক খবর (১২ জুন, ২০১২)। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মশাই সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে দেশের বাড়ি গিয়েছিলেন। নিকটবর্তী এক পান্থশালায় ভোজনান্তে দেহরক্ষী পরিবৃত্ত হয়ে নিজস্ব গাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর সহধর্মিনীও অপর একটি গাড়িতে চেপে ২২ মাসের কোলের মেয়েটি আর ছ' বছরের ছেলেটিকে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে অনুবর্তিনী হলেন। কিন্তু আট বছরের বড়কন্যা ন্যান্সি উভয়ের অলক্ষে পড়ে রইল পান্থশালায়, বেচারি তখন বাথরুমে গিয়েছিল। বাবা বা মা কেউ তার কথা খেয়াল করেননি। সম্ভবত বাবা ভেবেছিলেন যে স্বভাব-গার্জেন মায়ের কাছে আছে। আর মা ভেবেছিলেন বাপ-সোহাগী মেয়ে বাপের সঙ্গে আছে। বাড়িতে এসে খেয়াল হল, আরে, মেয়ে তো হোটেলে পড়ে আছে! আমার দেশে হলে স্বামী-স্ত্রীতে তুলকালাম বেধে যেত পরস্পরকে দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিপন্ন করতে। ওঁরা ঝগড়াঝাটি করেছিলেন কিনা জানি না, তবে, ব্রিটেনের দায়িত্বশীল প্রধানমন্ত্রী নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে গিয়ে মেয়েকে ফেরৎ নিয়ে এলেন। পারিবারিক অশান্তির কথা কাগজ লেখেনি।

আমার দেশের অনুরূপ কাহিনীটা বেশ পুরনো। ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালের বোধহয়। খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এলেন, পূর্বরেলের প্রথম বৈদ্যুতিক রেলগাড়ি চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে। সে আমলে রেলমন্ত্রীরা এসব করতেন না। ক'দিন আগেই অবশ্য হাওড়া-শেওড়াফুলির মধ্যে বিদ্যুৎ চালিত ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে—অনুষ্ঠান ছাড়াই। পুরনো দিনের একটা কাঠের রেলগাড়িতে দু'প্রান্তে জাপান থেকে কেনা দুটো হিটাচি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন জুড়ে ট্রেনটা নিয়ে যাওয়া হল প্রান্তিক স্টেশন শেওড়াফুলিতে। প্রচণ্ড ভীড়ে ঠাসা হাওড়া স্টেশনে সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুসজ্জিত ট্রেনটার বিশেষ কামরায় উঠলেন। গন্তব্য শেওড়াফুলি। ওখানে আবার একটা অনুষ্ঠান হবে।

সেসময় সুরক্ষার এত কড়াকড়ি ছিল না। সমবেত দর্শকদের এক বিরাট অংশও ঐ গাড়িতে বিনা পয়সায় সওয়ারি হয়ে চলল শেওড়াফুলির ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকতে। ট্রেনে আসন সংখ্যা সীমিত, কিন্তু রেলে একশ'জন বসিবেক, দুশ'জন দাঁড়াইবেক ও পাঁচশ'জন ঝুলিবেক (এখনো চালু রীতি) নীতির ফলে অনেকেই চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যায়। অসমর্থিত সংবাদ, কয়েকজন নাকি স্বধামে প্রস্থানও করেছিলেন।

> ছেলেরা মনে করল বুঝি গার্ড-ড্রাইভারের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তাই তারা আলাদা আলাদা যাচ্ছে। ছেলেরা হৈ হৈ করে উভয়কেই উৎসাহ দিতে লাগল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পারিবারিক সহযাত্রী ছিলেন শিশু দৌহিত্র, যিনি আটের দশকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পণ্ডিতজি ভাষণ-উদ্বোধনে ব্যস্ত, কিশোর দৌহিত্র আপনমনে শেওড়াফুলি স্টেশন ধরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন (সেসময় এস পি জি নামক নিরাপত্তা বাহিনী সৃষ্টি হয়নি, বোধহয় এত মৃত্যুভয় ছিল না বলে)। অনুষ্ঠান শেষ হল এক সময়, অতিথি বাহিনী ফিরে চললেন হাওড়ায়। ট্রেন ছাড়ল ভি. আই. পি-দের নিয়ে, আর প্রবীণ মন্ত্রীর কিশোর দৌহিত্র পড়ে রইলেন একাকী শেওড়াফুলি স্টেশনে। হাওড়া পৌঁছবার পরে হঠাৎ পণ্ডিতজির খেয়াল হল, "আরে রাজীব কাহাঁ?" চারিদিকে খোঁজাখুঁজি, ফোনাফুনি শুরু হয়ে গেল। অবশেষে খবর মিলল, তিনি তখনো একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন শেওড়াফুলি স্টেশন চত্বরে। ঘণ্টাখানেক পরে নাতি-দাদুর পুনর্মিলন হল। এখনো এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য মিলতে পারে। লেখক অন্যতম।

একই দিনে, ১২ই জুন ২০১২ তারিখের আর একটা খবরে চোখ আটকে গেল। টাটকা খবর। রেলের এক কেচ্ছা। জৈনতীর্থ রাজগীর স্টেশনে যাত্রা শেষ করে খালি গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ইয়ার্ডে বিশ্রাম নিতে যাবে বলে। হঠাৎ ভৌতিক কাণ্ড। ড্রাইভার গার্ড ছাড়াই গাড়িটা চলতে আরম্ভ করল। আশেপাশের লোকজন তো 'থ'। হৈ হৈ শুরু হল, স্টেশনমাস্টার দেখতে পেয়ে

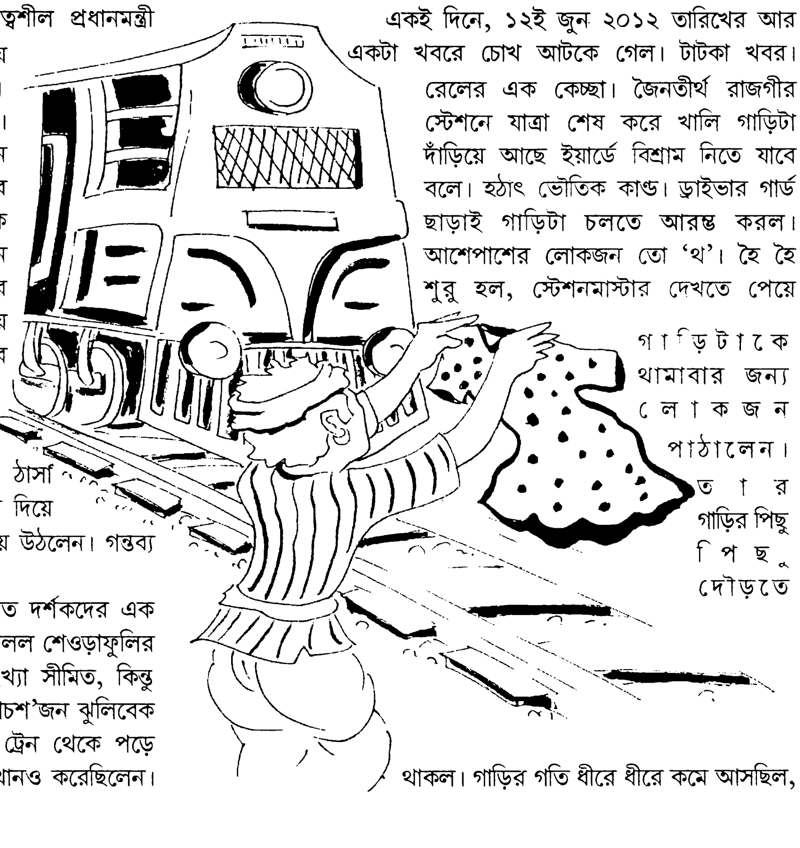

গাড়িটাকে থামাবার জন্য লোকজন পাঠালেন। তার গাড়ির পিছু পিছু দৌড়তে থাকল। গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে আসছিল,

অবশেষে চার কিলোমিটারের মতো যাবার পর উৎসাহী পশ্চাদ্ধাবনকারীদের চেষ্টায় গাড়িটা থামানো গেল। ভাগ্য ভালো, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। দোষী রেলকর্মীরা তিরস্কার বা পুরস্কার পেয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে একই ধরণের আর একটি ঘটনায় কর্মীরা ধিকৃত ও তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

দিনটা মনে আছে—তেনজিং ও হিলারির প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ স্পর্শ—২৯শে মে ১৯৫৩ সালের দুপুরে আকাশবাণীর খবর থেকে জানা যায় এভারেস্ট শৃঙ্গবিজয় কাহিনী।

অধুনালুপ্ত ঐতিহ্যবাহী বাঙালির গর্ব, বাঙালি পরিচালিত B. P. Rail (Bengal Provintial Railway) ন্যারোগেজ গাড়ি ত্রিবেণী-মগরা-দশঘরা-তারকেশ্বর শাখায় চলাচল করত। মাইল তিরিশ যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগত। চার নং ডাউন ট্রেনটা সঠিক সময় সাড়ে ন'টায় ত্রিবেণী ছাড়ল। গন্তব্য—মগরা হয়ে তারকেশ্বর। মাইলখানেক যাবার পর ত্রিবেণী কালীতলার কাছে গাড়ীর কাপলিং খুলে গেল আর ইঞ্জিনটা একা একাই যেতে থাকল মগরার দিকে। পাশেই রাস্তা দিয়ে ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে, তারা দেখতে পেল কি মজা, বগি ছাড়া একা ইঞ্জিন যাচ্ছে, আর পেছনে ইঞ্জিন ছাড়াই বগিগুলো দৌড়োচ্ছে। ছেলেরা মনে করল বুঝি গার্ড-ড্রাইভারের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তাই তারা আলাদা আলাদা যাচ্ছে। ছেলেরা হৈ হৈ করে উভয়কেই উৎসাহ দিতে লাগল আর ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে চলে গেল, গাড়িটার স্পীড ছিল, সেও পেছনে পেছনে যেতে থাকল। ওদিকে মগরা জি.টি. রোড লেভেল ক্রসিং। গেটম্যান দেখল শুধু ইঞ্জিনটা আসছে। সে ঘাবড়ে গেল। লাল পতাকাটা খুঁজে না পেয়ে মেয়ের লাল রং-এর ফ্রকটা দেখিয়ে ইঞ্জিনটা থামিয়ে ফেলল। ৪/৫ মিনিটের মধ্যে বগিটা এসে পৌঁছল। কোনোরকমে ইঞ্জিনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গাড়িটাকে মগরা রওনা করে দেওয়া হল। সেসময় লোকজন ও যানবাহন খুবই কম থাকায় কোনো বিপত্তি ঘটেনি। বি. পি. আর-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচরণ ভটচায সায়েব ড্রাইভার ও গার্ডসায়েবকে সাসপেন্ড করলেন, আর পয়েন্টসম্যান হাবুকে একটাকা জরিমানা করলেন কর্তব্যে অবহেলার জন্যে। গরিব হাবুর বেতন তখন এগারো টাকা মাত্র, এক টাকা জরিমানা শুনে সে কেঁদে ম্যানেজার সায়েবের পা জড়িয়ে ধরল। দয়ালু সায়েব তাকে আটআনা মকুব করে, এক বছরের মধ্যে সব ছুটি বাতিল করে দিলেন। ✂

এক হৃদয়ের সখা, চির আপন
শোক এবং দুঃখহর মহাপুরুষ
তাপিত বক্ষে শান্তিবারি
আমাদের দাদাভাই
শ্রী পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব গৃহের গৃহসখা, সর্ব প্রাণের আত্মীয়, সর্ব জনের সর্বস্ব ভালোবাসাময় তিনি। সাধক এবং কবি; ভাবুক এবং ভাবময়। চোখের আলোয় নেই তিনি আজ, কিন্তু মনের আলোয় প্রাণময়। আমাদের মনের তিমির তিনি আলোয় ভরে দেন। আপনার? চাইলেই ধরা দেবেন তিনি। চেয়ে দেখুন...

পীযূষালোক

৮৩ এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০৬৯

যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন—"আমাদের দাদাভাই-এর কথা"—১ম থেকে ১২শ খণ্ড। অর্থ নয়, একটু ভালোবাসা দিন, আর ভালোবাসা নিন চির-প্রেমময় দাদাভাই-এর।

নিজের আলোকে জ্যোতির্ময় নন। লোকে বলে মমতার জ্যোতিতে ভাস্বর আপনি আসলে ক্ষতিপ্রিয়।

লোপামুদ্রার ই-মেল

মাননীয় ফুড মিনিস্টার,

আপনি জ্যোতিপ্রিয়। কিন্তু জ্যোতি বসু আপনার প্রিয় নন, তা আপনার ভাষণ থেকে মালুম হচ্ছে। রাজনীতিতে ঘি না থাকলে শুধু ঘৃণা ছড়িয়ে কোনো লাভ হয় না। আপনার পেয়ারের লোকরা, যাদের কেয়ারে খাদ্য সংগ্রহ ও বিলিবন্টন ব্যবস্থা হচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে, তাদের সবাই কি মন্ত্রীসভার ঐ চেয়ারে আপনাকে পছন্দ করছে? না। কোথায় যেন ছন্দ কাটছে বলে মনে হচ্ছে।

আপনি স্যার তৃণমূলের জ্যোতিষ্কে একজন mini-star, তবে নিজের আলোকে জ্যোতির্ময় নন। লোকে বলে মমতার জ্যোতিতে ভাস্বর আপনি আসলে ক্ষতিপ্রিয়। জনগণের মন থেকে তৃণমূলেরই মূলোৎপাটন হচ্ছে ঘৃণা উদ্‌গীরণে আপনার মৌলিক প্রতিভায়।

বেড়ে ছিলেন অ্যাদ্দিন। হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে সি. পি. এম.-এর বিরুদ্ধে ফরমান জারি করতে গেলেন কেন? ভারি গোলমেলে লোক তো আপনি।

ইতি— লোপামুদ্রা

শেষপাত

আমু

মিছিলে ছিলে কি ছিলে না, এ নিয়ে
মিছিমিছি এক বাহানা বানিয়ে
উসকে দিচ্ছ কত জল্পনা,
উর্বর কিছু মস্তিষ্কের
ভাবনা প্রসূত নানা কল্পনা,
এবং কাগজেপত্রে তা নিয়ে
ফোয়ারা ছুটছে মন্তব্যের,
লিখছে কত কী ফেনিয়ে ফেনিয়ে।
নেতৃপদ যে কতটা risk-এর
জানো তো—পথটা গন্তব্যের
এক না হলেও, তুমিও মিছিলে
কিছুটা রাস্তা হেঁটে গিয়েছিলে—
ছিলে কি ছিলে না মিছিলে, এ কথা
কী সাফাই দেবে এখন দ্যাখো তা,
ধামাচাপা দিতে কোরো না কষ্ট—
ক্যামেরায় মুখ উঠেছে স্পষ্ট। ✂

নর্দমার কয়েক কাহন

অঞ্জনা দত্ত অঙ্কন সন্দীপ দেবনাথ

শুধুই পড়িবার জন্য, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

হায় কমলাকান্ত, আপনার দিন গিয়াছে। আফিমের মৌতাতে এবং গাঁজার ধোঁয়ার আড়াল হইতে আপনি যে সমস্ত বিশ্রম্ভালাপ করিতেন, বর্তমানে ফেসবুক, ই-মেল ইন্টারনেটের ধাক্কায় সেসব পড়িবার বা শুনিবার লোক নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের আর আপনার মতো আফিমের মৌতাত বা গঞ্জিকা সেবনের প্রয়োজন হয় না। চারিদিকে হরেক কিসিমের দূষণের জ্বালায় আমরা আপনা হইতেই নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি এবং সেই নেশার ঠ্যালায় কখনো কখনো আপনারই ন্যায় বিশ্রম্ভালাপ করিতে সাধ জাগিতেছে কিন্তু শুনিবে কে?

শ্রোতা না থাকিলে কি বলিয়া সুখ আছে? তাই ভাবিলাম আপনাকেই পাকড়াও করা যাইতে পারে। আপনি এককালে বলিয়াছেন, আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সে ভালো মন্দ যাহাই হউক না কেন। এখন আমরা কিছু বলিতে চাহিলে আপনিই বা না শুনিবেন কেন? আমার আব্দার রহিল, যাহাই বলি না কেন, আপনার আফিমের মৌতাতে অসুবিধা না হইলে কর্ণপটহটি খাড়া রাখিবার চেষ্টা করুন। যদি নিতান্তই কথাগুলি শুনিবার পর আপনার মৌতাত ভাঙিবার উপক্রম হয় তবে নাহয় তাহা জুড়িতে সাহায্য করা যাইতে পারে।

আপনি তো অনেক বিষয় লইয়াই বক্‌বক্‌ করিয়া কান-মাথা খাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু যেটির দিকে আপনারও নজর পড়ে নাই অথচ নিত্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তেমনই একটি বিষয় লইয়াই আমি বলিতে চাহিতেছি। আপনি বোধহয় স্বপ্নেও কখনো ভাবিতে পারেন নাই যে এমন একটি বিষয় লইয়াও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। বেশি ধানাই-পানাই না করিয়া বলিয়া ফেলাই ভালো যে আমার বিষয় হইল 'নর্দমা' অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া যে-কোনো রকমের জলীয় প্রবাহ নির্গত হইতে পারে। আমি নিজে কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাকে এই বিষয়টি লইয়া ভাবিতে হইতে পারে। কিন্তু যাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে কখনো আলাদা করিয়া ভাবিতে হয় নাই, প্রকৃতির জল, বাতাসের মতোই যাহা স্বাভাবিক ভাবে বিরাজমান থাকিয়াছে সেইটিই হঠাই করিয়া দুর্বহ হইয়া ওঠায় বাধ্য হইয়া ভাবিতে শুরু করিতে হইল।

আসলে যখন হইতে রাজমিস্ত্রীদের সিলেবাস হইতে 'নর্দমা তৈরি করিতে হইলে মেঝেতে ঢালু রাখিতে হয়' এই সারবাক্যটি উঠিয়া গেল তখন হইতেই এই ভাবনার শুরু। ফলে কোথাও কল খুলিলে মেঝেতে পতিত জলটি যে সোজা নর্দমার দিকে ধাবিত হইবে, হুঁ হুঁ বাবা ব্যাপারটি এত সহজ নহে। মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন, বোলারের ছোঁড়া বলটি মাঠে পড়িয়া কত দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উইকেট সমীপে ধাবিত হইবার চেষ্টা করে, কল থেকে মাটিতে পড়া জলটিও এদিক ওদিক ধাক্কা খাইয়া তবে সে নর্দমায় যাবার রাস্তাটি খুঁজিয়া পায়, সে যে জলই হউক না কেন, আপনার শরীর নিঃসৃত বর্জ্য জল বা বাসন-মাজা সাবান-জল অথবা কাপড় কাচার জল এবং যেখানে যেখানে ধাক্কা খায় সেখানে সে তার চিহ্ন রাখিয়া যাইতেও ভুল করে না। এ ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়াছিল পূর্ববর্তী বাসস্থানে কিন্তু বর্তমানের নয়া বাসস্থানে নর্দমার অভিজ্ঞতায় মনে হইল বোধহয় নর্দমার মহাভারত লেখা যায়। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা হইতেই নয়া বাসস্থান নির্মাণের সময় বারংবার মনে করানো হইয়াছিল যে দেখিবেন মহাশয়, সমস্ত নর্দমার ঢাল যেন ঠিক থাকে কিন্তু বাসস্থানে প্রবেশের পর বোধোদয় হইল যে রাজমিস্ত্রীদের সিলেবাসে 'নর্দমা ঢাল' শব্দবন্ধটিই নাই। তাহাদের আর দোষ দিয়া লাভ কি। গৃহকর্তাটি আর এক কাঠি সরেস। তিনি জানাইলেন যে মার্বেলের মেঝে হইলে নাকি অধিক ঢাল করা যায় না। মনে ভাবিলাম, মার্বেলের মেঝেতে যদি এমন সমস্যা জানিতাম তাহা হইলে আমার মার্বেলের মেঝের প্রয়োজন ছিল না। বাঁচিয়া থাকুক আমার সিমেন্টের মেঝে, গরমকালে মেঝেতে শুইয়া আরাম পাওয়া যাইত, গরম মেঝে হইতে ছ্যাঁকাও লাগিত না, নর্দমার ঢালও পাওয়া যাইত। কিন্তু কি যে দিনকাল পড়িল, খাই না খাই, মার্বেলের মেঝে চাই, না হইলে প্রেস্টিজ পাংচার। সে তুমি ভোগো নর্দমা লইয়া, তাহাতে আমার কি!

এইবার বলি ভোগান্তির ব্যাখ্যান। প্রথমে বলি নর্দমার প্রকারভেদ। রান্নাঘরের নর্দমা (যেটি সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হয়), স্নানঘরের নর্দমা (ওরও বিবিধ কারণে গুরুত্ব সমধিক), বারান্দার নর্দমা (বেশি ব্যবহার নাই, যদি না আধুনিক কাপড় কাচার যন্ত্র ব্যবহার হয়), ছাদের নর্দমা (বৃষ্টির সময় বেশি ব্যবহৃত হয়)। ইহা ব্যতীত আমাদিগের ছোটবেলায় শয়নকক্ষে নর্দমা বলিয়া একটি বস্তু ছিল যেটিকে প্রয়োজনে

ঘর ধুইবার জন্য ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু পূর্ববর্তী বাসস্থানেই নবলব্ধ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল যে ওসব নাকি আজকাল অচল, ঘর ধুইবার আর সময় কাহারো নাই, মুছিলেই যথেষ্ট, সেজন্য পূর্ব হইতে যে নর্দমার অস্তিত্ব ছিল, শয়নকক্ষটি সংস্কারকালে সেটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং একই যুক্তিতে বর্তমান বাসস্থানেও কোনো শয়কক্ষেই নর্দমার অস্তিত্ব রাখা হয় নাই, রাখিলে নাকি অযথা পোকামাকড় ঢুকিয়া বিব্রত করিতে পারে। যেমন নাকি ঘুলঘুলি রাখিলে পাখিরা বাসা বানাইতে পারে বলিয়া সেটিও উঠিয়া গিয়াছে। যাক, শয়নকক্ষে নর্দমা না থাকায় অন্তত একটি নর্দমার ভোগান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেল, কখনো ঘর ধুইবার শখ হইলে কেলেঙ্কারি হইয়াছিল আর কি। গোটা ঘরেই জল ঘুরিতে থাকিত আর আমি তাহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকিতাম। কিন্তু নর্দমা অভিমুখে তাহাকে পাঠাইতে পারিতাম না। কারণ—নর্দমা অভিমুখে ঢাল নাই। (মার্বেলের মেঝেতে যে ঢাল করা যায় না!) আগে বাচ্চারা স্নান করার সময় স্নানঘরের নর্দমার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া জল জমাইয়া খেলা করিত। আমাদিগের স্নানঘরে নর্দমা বন্ধ করিবার কষ্ট করিতে হয় না, কল খুলিলে আপনা হইতেই জল জমা হয়। আপনি যতক্ষণ না তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইতেছেন সে আপনার জন্য অপেক্ষা করিবে এবং পাঠাইবার চেষ্টা করিলেও সে কিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলিবে। তাহার পর কুলুকুলু রবে জানান দিবে যে সে যাইতেছে। কুলুকুলু রব থামিলেই বুঝিবেন সে পুনরায় থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ঠেলাঠেলি, আবার লুকোচুরি, তাহার পর পুনরায় কুলুকুলু। নিশ্চিন্ত মনে স্নান করাও দায়। বিশেষত সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করিলে বা সাবান দিয়া কাচাকুচি করিলে সে ফেনাও লুকোচুরি খেলিতে পটু হইয়া আপনাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ছাড়িবে। ঐ প্রসঙ্গে বলি কলের কথাও। এতদিন জানিতাম কল খুলিলে সোজা জল পড়ে, বালতি বা যাহাই হউক সেই পাত্রে। কিন্তু আমাদের কলের মুখনিঃসৃত সম্পূর্ণ জলটিকে ধরিতে হইলে সাধারণ বালতি বা বাথটবের কর্ম নহে, লাগিবে স্নানকক্ষ মোড়া একটি জলপাত্র, না হইলে তাহার ছটায় অর্ধেক জলই পাত্রের বাহিরে পড়িবে। আর শাওয়ার বা ঝর্ণাকলের কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর সিনেমার সংলাপের ন্যায় 'মারব এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে' গোছের। 'ঝর্ণাকল খুলব এখানে জল পড়বে ওখানে'। আমি শহরবাসী মানুষ স্নানঘরে কলের তলায় বা শাওয়ারে স্নান করিতে অভ্যস্ত ছিলাম। বিবাহ পরবর্তী জীবনে পুকুরে স্নান করিতে অভ্যস্ত শাশুড়ি, দিদিশাশুড়িদের মতামত ছিল যে পুকুরে না করিয়া স্নানঘরে স্নান করিলে নাকি হাত পা মাথা সব আলাদা আলাদা করিয়া ভিজাইতে হয়। তাঁহাদের এই মতামত আমি মানিতে প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু আমার বর্তমান স্নানঘরের ঝর্ণাকলের অভিজ্ঞতার পর তাঁহাদের অভিমত না মানিয়া উপায় নাই। পুরানো অভিজ্ঞতায় ঝর্ণাকলের স্নানে যে আনন্দ ছিল তাহা বর্তমানে সম্পূর্ণই অন্তর্হিত হইয়াছে এবং সত্যই হাত পা মাথা আলাদা করিয়া ভিজাইতে হইতেছে এবং তাহার মাঝেই খেয়াল রাখিতে হইতেছে যে পদতলে ক্রমশ গোড়ালি ছাপাইয়া জল উঠিতেছে কি না। সুতরাং আধভেজা অবস্থাতেই আবার জলের সহিত একপ্রস্থ লুকোচুরি খেলিতে হইতেছে, কারণ?—ঢাল না থাকা নর্দমা। এতদিন জানিতাম কল খুলিলে জল নর্দমা অভিমুখে ধায়, সে কখনো ফিরিয়া আসে না, কিন্তু বর্তমান অভিজ্ঞতা ভিন্ন। এক বালতি জল ঢালিলে সম্মুখে না গিয়া পিছনপানে ফিরিয়া আসে। তারপর তাহার ইচ্ছা হইলে ধীরে মৃদুমন্দ গতিতে যাইতে থাকে কিন্তু ততক্ষণ কি আপনি পরবর্তী বালতির জলটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন? ফলত বিকল্প পথ খুঁজিতেই হয়। হয় কমোড নয় বারান্দার নর্দমা। কিন্তু তারাও কিছু কম যায় না। কখনোই সম্পূর্ণ যাইবে না। কিছুটা ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। বাড়ির কিছু কিছু অংশে তো নর্দমাই রাখা হয় নাই, মনে হয় সেখানে ভরসা করা হইয়াছে স্রেফ সূর্যদেবের উপর, কারণ সেগুলি খোলা অংশ। ফলে জল জমে, তারপর সূর্যদেব যেমন যেমন দয়া করেন সেরকমই সেই অংশের গতি হয়। কোনো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ঐ অংশগুলি দেখিলে সুইমিং পুলও ভাবিতে পারে; যেমন নাকি শুনিতে পাই নব্য বেহালা অঞ্চলে এমনই সব নর্দমার হাল যে জলকে নালা দিয়া ফেরৎ পাঠাইতে চাহিলে সে পূর্ণবিক্রমে ফিরিয়া আসে এবং বহাল তবিয়তে বিরাজ করে, যতদিন না সূর্যদেবের নিষ্ঠুরতায় ক্ষীণকায় হইতে হয়। ততদিন বাচ্চারা অবশ্যই তাহাতে সাঁতার শিখিতে পারে।

বলিতে ভুলিয়াছি স্নানকক্ষের নর্দমাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাই। তাহার আচরণ যথার্থ রাজহংসেরই ন্যায়। রাজহংস যেমন, শোনা যায়, জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল বাদ দিয়া দুগ্ধটুকুই সেবন করিতে পারে, আমাদের স্নানকক্ষের নর্দমাও তাহাই, ময়লাবাহিত জল হইতে ময়লাটি ছাঁকিয়া শুধুমাত্রই জলটিই গ্রহণ করে। অনেক কষ্টে বাচ্চার গালে ঠেলিয়া ভাত খাওয়াইবার ন্যায় ময়লাকে পার করাইতে হয়।

এইবার বলি রন্ধনকক্ষের এক এবং অদ্বিতীয় নর্দমাটির কথা, যেটিতে জল যাইবার রাস্তা করা আছে রান্নাঘরের বেসিনের নর্দমার সহিত পাইপ সহযোগে একেবারে রান্নাঘরের পাঁচিলের বাহিরে জলটি ফেলিবার জন্য। বেসিনের নিম্নে একটি কল আছে কিন্তু সেটির জল কোথা দিয়া যাইবে আমার জানা নাই, কারণ বেসিনের পাইপ বাহিত হইয়া যে জলটি সরাসরি বাহিরে যাইবার কথা সেটি বাহিরে গিয়া আবার কোন কৌশলে ভিতরে চলিয়া আসে এবং দীর্ঘসময় ঐ স্থানেই অবস্থান করে, কখনো কখনো ঘরের আরো ভিতরে অগ্রসর হইয়া রান্নাঘরটিকেই পুকুর বানাইবার উপক্রম করে তাহাও আমার বুদ্ধির অগম্য। ইহার ফলে বেসিনটি যে যে কর্মের জন্য নির্ধারিত সেগুলি করিতে গেলে অবশ্যই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। যেমন ভাতের ফ্যান ফেলা, মাছ মাংস ইত্যাদি ধোয়াধুয়ি করা, বাসন মাজা ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৃহের প্রস্তুতকারক মহাশয় ভাতের ফ্যান না ফেলিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তাহার বিকল্প কোনো পথও দর্শাইতে পারেন নাই। মাছ ধুইতে গিয়া রান্নাঘর পুকুর হইবার উপক্রম করায় নিরুপায় হইয়া সাবানের ডেকচির শুচিবাই ত্যাগ করিয়া তাহাতেই জল লইয়া মাছ ধুইলাম, না হইলে স্নানের বালতি কিংবা বাথটব লইতে হইত। কারণ আড়াই কেজি মাছ ধুইবার ন্যায় অত বড় পাত্র নাই, এতদিন সরাসরি বেসিনই সেই কাজ করিত। কিন্তু নতুন রাজমিস্ত্রীদিগের নির্মিত ঢালবিহীন নর্দমার জন্য আমি শুচিবায়ুমুক্ত হইলাম। অনায়াসে সাবানের ডেকচিতে মাছ ধুইলাম। তাঁহারা আমাকে শুচিবায়ুমুক্ত করিবার জন্য নমস্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জল এইবার ফেলিব কোথায়? ভাবিলাম বারান্দার নর্দমা সহায় হইতে পারে। কিন্তু মংসগন্ধী জল নর্দমাতে না ঢুকিয়া বারান্দাতেই রহিয়া যাইতেছে। আরো বিপদ, নর্দমাতে কষ্ট করিয়া ঢালিতে পারিলেও সেটি তো ক্ষুদ্র পাইপ বাহিয়া ছরছর্ করিয়া উঠানে পড়িবে এবং সেখানে কোনো নর্দমা নাই, সূর্যদেবই ভরসা, ততদিন মাছের গন্ধ শুঁকিতে থাকুন। রাগ করিয়া কিছুদিন মাছ আনা বন্ধ করিলাম কিন্তু সে আর কতদিন, তাহা হইলে তো মাছ না খাইয়া থাকিতে হয়। অতএব অগতির গতি মাছের জল, ভাতের জল, ঘর মোছার জল, সাবান কাচার জল ঢালিতে হইতেছে ক-মো-ডে। একমাত্র ঐটির জলই ঠিকঠাক যায়। ভাগ্যিস!!

হায় কমলাকান্ত তুমি থাকিলে তোমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অহিফেন কর্জ লইয়া সেবন পূর্বক দিব্যজ্ঞান লাভ করিতাম। এবং তৎপরে উপলব্ধি করিতাম ইহার গূঢ় রহস্য, কেন এরূপ হয়। কিন্তু তুমি নাই, বাজার হইতে যে দুই ভরি সংগ্রহ করিব তাহারও উপায় নাই, সরকার অহিফেন নিষিদ্ধ করিয়া মহাজ্ঞান লাভের বারোটা বাজাইয়াছে। অতএব নর্দমার জলের সহিত নাকের জল চোখের জল মিশাইতে মিশাইতেই দিব্যজ্ঞান লাভের বৃথা চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে।

সাহিত্য দুঃসংবাদ

অনেকদিন ধরে "পত্রপাঠ"-এর পাতায় সাহিত্য দুঃসংবাদের কোনো খবর নেই। আসলে বাংলা সাহিত্য এমনই সুসংবাদে ছেয়ে গেছে যে মন্দ কিচ্ছুটি আর বলার নেই। যা বেরুচ্ছে তা-ই মুক্তো। মুক্তকচ্ছ হয়ে লোকে পড়ছে, থুড়ি, পালাচ্ছে সেসব দেখে। সে যাই হোক, হালফিলের নামি পত্রিকাগুলো আপনাদের চোখে পড়েই। প'ড়ে নিজেরাই বুঝতে পারেন তা কতটা সুসংবাদ অথবা দুঃসংবাদ বহন করে এনে আপনার মানসিক গোডাউনে ডাউনলোড করছে। সকলের কাছে পৌঁছয় না, এমন একটি কাগজের নমুনা তুলে ধরা যাক।

সুদূর আন্দামান থেকে "বাক্‌প্রতিমা" পত্রিকাটি প্রকাশ করেন অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস। তার ১৩১ সংখ্যক কপিটি হাতে এসেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ে ওপরে নাকি তাঁরা এই সংখ্যায় বিশেষ আলোকপাত করেছেন বলে প্রচ্ছদে ডি এল রায়ের ছবি-টবি দিয়ে সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন। পত্রিকা টুঁড়ে একটিমাত্র লেখা পাওয়া গেল ডি এল রায়ের ওপর—"দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে লোকশ্রুতি"। আসলে আলোকপাত করার টর্চের ব্যাটারি বোধহয় বড়ই দুর্বল ছিল। একদিকপানে টর্চ মেরেই ব্যাটারি শেষ। "টর্চ নিয়ে টর্চার" বলাই ভালো। তা বলাই ভালো না কানাই ভালো তা নিয়ে আমরা বিতর্কে যাব না। সবাই ভালো। পত্রিকার কবিতা বিভাগে চোখ বুলিয়ে একটা কবিতা বেশ তাক লাগিয়ে দিল।

নামান্তর

শ্রীময়ী চক্রবর্তী

ভালোবাসার অন্য নাম কি শুধু
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকা
অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস?

নামান্তর পড়ে এমন ভাবান্তর হল আমাদের যে মুখে আর বাক্যি সরে না। ভালোবাসা-টাসা বিশেষ বুঝি না। তবে কবির শেষ লাইনটি বেশ আমাদের ওপর জাঁকিয়ে বসেছে দেখলুম। অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস। ফেলেই যাচ্ছি, ফেলেই যাচ্ছি, শেষ আর হয় না। তবে সকলেরই তা হবে এমন কোনো কথা নেই। প'ড়ে আপনাদের হ্রস্বশ্বাসও পড়তে পারে। হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ বানানে উঠে গেছে। শ্বাসেই বা থাকে কেন?

—মৈনাক মিত্র

কার্টুন : বিপ্লব ভট্টাচার্য

এক ঔরত কে তালাকসুদা ভূতপূর্ব্ পতি আউর বর্ত্মান পতি কে বিচ্ সম্বন্ধ্

প্রসন্ খড়গ্পুরী

ম্যায়নে অভূতপূর্ব্ বিষয় উছালা
যিস বিষয় পর সোচনে মেঁ
পশ্চিমী দার্শ্নিক-বিজ্ঞানীকোঁ কা
হো গয়া থা ব্রেণ হ্যামরেজ
ভার্তীয় ঋষি-মহর্ষিয়োঁ কা ভি
উড়্ গয়া থা দিমাগ কা এক ফেজ
ম্যায়নে আশ্চরিয়াজনক কারিয়া কর ডালা
এক ঔরত কে তালাকসুদা ভূতপূর্ব্ পতি
আউর বর্ত্মান পতি কে বিচ সম্বন্ধ কেয়া হোগা
ইস পর রিসার্চ কর ডালা।

রিসার্চ ইস প্রকার কিয়া—
পত্রপাঠ কে সম্পাদোদক শ্রী শেখর আহমদ
সে সম্পর্ক কিয়া
উন্হে সমস্যা বাতায়ি
তো উন্কি বুদ্ধি চক্রায়ি
উয়ে বোলে—আমি তুম
হাস্যকবি নয়ে হো
ভাবনায়োঁমে বহ গয়ে হো
হাস্য-ব্যঙ্গ্ কে ক্ষেত্রমে আগর
এয়সি কবিতা পর কাম করোগে
তো ভারত কে অন্য্ নিরীহ
হাস্যকবিয়োঁ কো হি
বদনাম করোগে।
ম্যায়নে কহা—
ইয়ে ঘট্নায়েঁ সমাজমে হি হোতে হঁ্যায়
উন্হি মেঁসে কোই সামাজিক সম্বন্ধ্ হো সকতে হঁ্যায়
জি সোচনেমে কেয়া যাতা হ্যায়
আখির আপ ভি হাস্য-ব্যঙ্গ্ পত্রিকা কা সম্পাদক হঁ্যায়
য়হ তো সব কো পতা হ্যায়।

য়হ শুনকর উন্কা বিবেক জাগা
সহমতি মে শির হিলায়া।
ম্যায়নে রিসার্চ কো ইস প্রকার আগে বঢ়ায়া,
বোলা—এক ঔরত কে তালাকসুদা ভূতপূর্ব্ পতি
বর্ত্মান পতি কা বাপ হোগা।
উয়ে হাঁসে, বোলে—য়হ নেহি হোগা
ভূতপূর্ব্ পতি বর্ত্মান পতি কা সসুর হোগা।
ম্যায় নে বোলে—য়হ ভি নেহি হোগা,
ভূতপূর্ব্ পতি বর্ত্মান পতি কা সালা হোগা।
উয়ে বোলে—য়হ ক্যায়সে হোগা?
তব্ ভূতপূর্ব্ পতি আউর বর্ত্মান পতি কে বিচ্ সম্বন্ধ্
সম্ধী কা হোগা।

উয়ে জোর সে হাসে, বোলে—কভি নেহিঁ হোগা।
ইস্ প্রকার ম্যায়নে সব্হি সামাজিক সম্বন্ধোঁ কো গিনায়া।
উত্তর মেঁ শেখরজি নে "না" কা শির হিলায়া,
উয়ে গুস্সা কর্ বোলে—
কিঁউ মেরা শির ব্যর্থ্ মেঁ খাপাতে হো
অসম্ভব কারিয়ো মে তুম বিচার লড়াতে হো
আপ তসরিফ্ লে যাইয়ে
দুবারা ইস্ প্রশ্ন্ কো লেকর
য়হাঁ নেহিঁ আইয়ে।

দুস্রে শব্দোঁ মেঁ উন্হো নে মুঝে
ঘর্ সে বাহার নিকাল দিয়া।
ম্যায়নে বিচার কিয়া,
আকেলে মে প্রয়াস করুঙ্গা,
ইস্ সম্বন্ধ্ কি অবশ্য্ তালাশ করুঙ্গা।
অনেক ঐতিহাসিক ধর্মশাস্ত্র মেঁ
নজরেঁ গড়াইঁ
মহাভারত মেঁ ম্যায়নে
য়হ বাত পায়ি
লেকিন কুন্তী কে পূর্ব্ পতিয়োঁ এবম্
বর্ত্মান পতি পাণ্ডু কে বিচ
সম্বন্ধ্ কেয়া থা
মহর্ষি বেদব্যাস কো ভি
ইস কা নেহী পতা থা।
আগর উয়ে জানতে তো জরুর লিখ্ যাতে।
পূজ্য্ ধার্মিক মহাভারত কো
অপূর্ণ্ নেহী ছোড় যাতে।

হর ক্ষেত্র মেঁ দিমাগ দৌড়ায়া,
আচানক অন্তজ্ঞান সে
য়হ ব্যঙ্গ্ জ্ঞান পায়া—
ইস্ সম্বন্ধ্ কো হাম তব তক
আপ সব কো নেহিঁ বাতায়েঙ্গো
যব তক কি আপ কিসি ঔরত কে
ভূত্পূর্ব্ পতি আউর হাম উসকে
বর্ত্মান পতি বন যায়েঙ্গো।
সিচুয়েশন কো ফরন্ সামনে লাইয়ে
আপনি পত্নী কো তালাক দে কর
মুঝসে শাদী করওয়াইয়ে।
আরে! আপ কা বাচ্চা তো হ্যায় হি
উসে হামারে সামনে লাইয়ে।
আপ কা বাচ্চা আপ কি ভূতপূর্ব্ পত্নী কো
"মা" কহেগা, "মা" হি কহেগা!

উহ বাচ্চা আপ কো "পিতা" কহেগা
আপ কা বাচ্চা না জানে হাম কো
কেয়া কহেগা
য়হ সোচ্‌কর ম্যাঁয় ডর গয়া হুঁ
উস্‌কি নজরোঁ মেঁ উস্‌কি মা কা
ম্যাঁয় অপ্‌হরণ-কর্তা বন্‌ গয়া হুঁ
য়হ বাচ্চা হি হাম দোনো কে সম্বন্ধ্
কো দিখাতা হ্যায়
হামমেঁ সে এক অপ্‌হৃত্‌ হ্যায়
দুস্‌রা অপ্‌হরণ-কর্তা হ্যায়।

ফুল কি কলী সি
য়হ মাসুম নয়ী পীঢ়ী
কেয়া কভি হামেঁ মাফ্‌ করেগা?
উস্‌কে আঁখোমেঁ মা কে খোনে কে গম্‌ কি
আঁসুয়োঁ কি বহ্‌তি অবিরল ধার তো দেখো
নেহী মাফ্‌ করেগা, নেহী মাফ্‌ করেগা
কভী নেহী মাফ্‌ করেগা।

ভাবানুবাদ মৈনাক মিত্র

অঙ্কন প্রণব হোড়

এমন একটা প্রশ্ন মাথায় গজিয়ে উঠল
যেটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে ইউরোপ আমেরিকার
বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের হয়ে গেছে ব্রেণ হ্যামারেজ
আর ভারতের ঋষি-মহর্ষিদের
উড়ে গেছে চিন্তার বিদ্যুৎ-লাইন থেকে আস্ত একটা ফেজ।
প্রশ্নটা খুব সোজা
কিন্তু সহজ নয় তা বোঝা
বিচ্ছেদের পর নতুন বরের সঙ্গো
আগের বরের সম্পর্কটা দাঁড়াচ্ছে কোন রঙ্গো?
এই নিয়েই আমার রিসার্চ
তা সে যাই বলুন, ইয়াহু বা গুগ্‌ল সার্চ।

পাকড়াও করলাম পত্রপাঠের সম্পাদোদক শেখর আহমেদ মশায়কে
তিনি ছাড়া আজব বিষয় মগজ থেকে খসায় কে?
মাথা নেড়ে বলেন তিনি,—হাসির লেখা সহজ নয়
তোমার বিষয়, সন্দেহ নেই, হাস্যকর তা অতিশয়।
এমন লেখা লিখলে মোটেই পাবলিক তা খাবে না
অন্য যত ব্যঙ্গা কবির সুনাম রেহাই পাবে না।
আমি বললাম,—দেখুন মশাই, সমাজে তো এমন ঘটে
এড়িয়ে যেতে চাইলেও এই সমস্যাটা রইবে বটে।
হাসির কাগজ করেন যখন, আপনাকেই তা জানতে হবে
সমস্যাটা জটিল, তাও এক বাক্যে মানতে হবে।

আমার কথা শুনে তিনি ঘাড় হেলাতে বাধ্য হলেন।
আমিও মওকা পেয়ে বললাম,—শুনুন তবে মন দিয়ে,
আমার গবেষণায়
এর উত্তর এমন শোনায়—
আগের বরটা হয়ে যাবে নতুন বরের বাপ।
শুনেই তিনি একটু হলে দিচ্ছিলেন এক লাফ।
টেনে ধরায় বলেন তিনি,—নিও না ভাই কসুর
আগের বরটা হয়ে যাবে নতুন বরের শ্বশুর।
আমি বললাম মোটেই তা নয়, সম্পর্কের ঝালায়
পুরনো বর হয়ে যাবে নতুন বরের শালা।
উনি বললেন,—হাসালে ভাই, তাও কখনো হয়?
তোমার মাথার নাটবল্টু নড়বড়ে নিশ্চয়।
আমি বললাম,—দুই পক্ষের সম্বন্ধ তবে
বেয়াই গোছের হবে।
এবার ক্ষেপে বলেন উনি, বড্ড সময় নষ্ট
করছ, এবার শোনো তোমায় বলছি আমি পষ্ট
অদ্ভুতুড়ে ভাবনা নিয়ে এখন পড়ো কেটে
আবার এলে দিতে হবে দরজায় খিল এঁটে।

উনি তো আমায় দিলেন ঘর থেকে বের করে;
আমি ভাবলাম, কুছ পরোয়া নেহি, একাই লড়ে যাব।
এর উত্তর না বের করেছি তো বাপের ব্যাটাই নই।
অনেকানেক ধর্মশাস্ত্র ঘেঁটে, শেষে মহাভারতে পড়ল চোখ,
কিন্তু কুন্তীর আগের স্বামী আর বর্তমান স্বামীর সম্পর্ক কী,
দেখি মহর্ষি ব্যাসদেবেরও তা জানা ছিল না।
জানলে কি আর তা না লিখে এমন পূজ্য মহাভারতকে
এমনি অসম্পূর্ণ করে রেখে যেতেন?
অনেক জায়গায় অনেক মাথা ঘামিয়ে
শেষ পর্যন্ত উত্তরটা করেছি আবিষ্কার,
কিন্তু এখনই তা বলব না, যতক্ষণ না
আপনি কোনো নারীর প্রাক্তন স্বামী
আর বর্তমান স্বামী আমি না হচ্ছি।
ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়িই করুন
নিজের বৌকে ডিভোর্স করে ফেলুন
তারপর নিজে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গো বিয়েটা তার সারুন।

এবার, আপনার যে বাচ্চা আছে—
আমার সামনে আনুন।
আপনার প্রাক্তন স্ত্রীকে সে বলবে মা
আর আপনাকে বলবে বাবা
এদিকে সম্পর্কে ভিত্তিমূলে আমি যে দিয়েছি থাবা—
সে তো আমায় চেনেই না
কী বলবে তা জানেই না!
তার চোখে তো আমি তার
মাতৃদেবীর কিডন্যাপার!
ভেবেই উঠি শিউরে,
অর্থাৎ কিনা আমরা দু'জন—
একজন অপহরণকারী
অন্যজন সর্বস্ব অপহৃত দুর্ভাগা।

ফুলের মতো বাচ্চাটাকে ভাবো
আমায় সে কি কোনোদিনই করতে পারবে মাফও?
মা হারানোর দুঃখে চোখের জল কোনোদিন শুকোবে?
তার বেদনা কি করে ভাই লুকোবে?
দিন যাবে আর বুকের মধ্যে আগুন হবে জমা
সে কোনোদিন আমাদেরকে করবে না ভাই ক্ষমা।

ক্ষ্যামা করিনি

সেদিন প্রেমিকের সঙ্গো একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বাবা দূরে চাকরি করেন, মা তাঁর কাছে গেছেন দু'দিনের জন্যে। বাড়িতে আমি একা। মেজাজ এত খারাপ হয়ে গেছে যে আর কহতব্য নয়। রাগে গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করলাম, ও ফিরে আসতে চাইলেও আর কোনো সম্পর্ক রাখব না। এদিকে ঘুম আসছে না কিছুতেই। বাধ্য হয়ে একটা ঘুমের বড়ি খেলাম। একটু একটু করে চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। একসময় মনে হল অনেক দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে। ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি। তারপর মনে হল একটু কাছেই কোথাও ডাকছে। তারপর মনে হল আরো একটু কাছে। তারপর যেন কানের কাছেই গর্জন। ওঃ, কানমাথা ঝালাপালা হওয়ার যোগাড়। ঘুমের দফারফা হয়ে গেল একেবারে। পাড়ার রাস্তায় থাকা সবক'টা নেড়িকুত্তা ঠিক আমাদের একতলা বাড়ির পিছনদিকে জড়ো হয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছে। এভাবে ঘুমোনো যায়! উঠে বসে দেখি জানালার ওপারে একটা সিড়িঙ্গোমতো লোক পোঁ পোঁ করে দৌড়ে পালাচ্ছে। আলো জ্বালালাম। দেখলাম জানালার একটা শিক কাটা। চোর বাবাজীবন কুকুরের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হলেন। ভাবলাম, এত বাড়ি থাকতে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে চোর মহাপ্রভুর আগমন কেন? আমার কিনা বুদ্ধি আবার খুব টনটনে। সঙ্গো সঙ্গো কারণটা মাথায় খেলে গেল। এ নিশ্চয় আমার সেই বদমাশ প্রেমিকটার (ততক্ষণে প্রাক্তন) কাজ। আমাকে ঘুমোতে না দেবার জন্যে এ তার গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সে কারণে আজ পর্যন্ত তাকে, চোরটাকে এবং পাড়ার কুকুরগুলো, যারা তার কথায় নেচে উঠেছিল, তাদের কাউকেই ক্ষ্যামা করিনি।

রেণুবালা, স্ত্রী, ৫৮

মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
ডঃ শিশির মজুমদার ও মনোজিৎ বসু

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
অধ্যাপক কমলেশ চন্দ্র লাহিড়ী

মেদিনীপুর বুক ডিপো
১২, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ২২৪১-৪২১২/৭৬০২

চলন্তিকা প্রকাশক
৪, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

রসকাব্য

শেষপাত রিপোর্ট

আমু

কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছে ক'টা খিটখিটে বুড়ো
দাস ক্যাপিটাকে তারা গিলে খেয়ে ওগরায় পুরো;
কমা ড্যাশ সরিয়ে কি তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া গেছে?
কারাটের কৃত ক'টা ভুল সব তারা দাগিয়েছে,
চোখা চোখা কোটেশনে প্রতিবাদ হয়ে গেছে গুঁড়ো।

পালিত বুড়োরা বসে পলিটব্যুরোতে তুলে হাই
বলছে—ভুলটা হয়ই, এতে তো নতুন কিছু নাই!
সংগঠনটা গড়ো, মন দাও কমিটি গঠনে।
সেসব করেও যদি পার্টি ফান্ডে মূলধনে
ü£ ¯ų, ũZ Êų. ïl û ïüî ü%Ô %N ÁîA

চোখের ওপরে যে দুটো চোখ—
যেমন কাজের, তেমনি সাধের
অপূর্ব এই দুনিয়াটাকে
চোখের আলোয় রাখুন
দু চোখ কিংবা চার চোখ,
আপনার চোখের যে কোনো সমস্যায়—
ক্যালকাটা স্পেকট্যাকলস
২২০ ডি, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ
গড়িয়াহাট, কলকাতা-৭০০ ০১৯
দূরভাষ ২৪৪০-২৯০৩
৬৫২০-৮৮১৩
চার চোখের মিলন ঘটাতে পুরুত ঠাকুর,
থুড়ি, ডাক্তার ঠাকুর সর্বদাই হাজির।

রসকাব্য

রেখায় লেখায় যুগলবন্দী

প্রণব হোড়

লেখক ও সম্পাদক

সম্পাদক

কী এমন লেখা দিলে
আদিরস নাই রে
পাতা জুড়ে ছাপাব কি
উনানের ছাই রে?
সারা রাত নো সেক্স
বর-বৌ কুস্তি
জেলে ঢুকে তবে পেল
মুক্তির স্বস্তি!
এই যদি সাবজেক্ট
লিখে তবে লাভ কি?
বিছানায় জ্বলছে
বিবাহের Love কি?

লেখক

আধুনি ভালেবাসা
যুক্তির বাইরে
লাথি-ঝাঁটা, কোর্ট কেস
আর কিবা চাই রে?
No Sex, তাতে কি?
Violence রইল—
তাও যদি না ছাপান
কচুপোড়া হইল।

হায় লেখক

বর্ষায় ম্যালেরিয়া বাড়াইছে শুধু মশা
ভাবিয়া দেখে না কেহ লেখকের দুর্দশা
লিখে যদি ক'ন তিনি—এ লেখার এই Rate,
প্রকাশক লেখা তাঁর করিবেন পাইরেট।

SOM BOOKS INTERNATIONAL

DISTRIBUTOR & AGENT OF FOREIGN TECHNICAL,
SCIENTIFIC & MEDICAL BOOKS

SBI

SOM BOOKS

FOR DETAILS, PLEASE CONTACT:

7, Raja Rajnarayan Street
Kolkata-700 009

e-mail som_books@yahoo.co.in
som_books@rediffmail.com

☎ **(033) 2351 2022 (033) 2360 8295**
Cell : (+91) 98315-98120

REGISTERD Postal Registration No.- KOL RMS/ 125/ 2010-12
PATRAPATH ❋ 4 AUGUST 2012 ❋ VOL-13 ❋ ISSUE-1 ❋ Regd. No.- WBBEN/ 2000/ 5855 ❋ Rs. 10.00

সোলার ফটোভোল্টিক ও থার্মাল সরঞ্জাম এবং বিকল্প জ্বালানী বায়োগ্যাস

সোলার লণ্ঠন

১২ ভোল্ট ৭ এ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি ১০ ওয়াট মডিউলে চার্জ হয়।
ঐ মোবাইল চার্জারও থাকবে।

সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম

নানা মডেলের হোম লাইটিং সিস্টেম পাওয়া যায়, যা থেকে লাইট, পাখা, টিভি ইত্যাদি চালানো যায়।

সোলার ওয়াটার হিটিং সিস্টেম

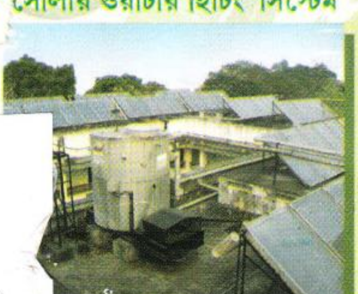

সোলার কুকারে রান্না করুন
বাঁচবে জ্বালানীর খরচ
অক্ষুণ্ণ থাকবে নির্মল পরিবেশ

সোলার কুকার

কল্প জ্বালানী বায়োগ্যাস

…কা	সিস্টেমের ক্ষমতা	খরচ	ভর্তুকির পরিমান
দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চল	১ ঘনমিটার	১০,০০০/- থেকে ১২,০০০/-	৪,০০০/-
ঐ	২ ঘনমিটার	২০,০০০/- থেকে ২৪,০০০/-	১০,০০০/-
অন্যান্য এলাকায়	১ ঘনমিটার	৮,০০০/- থেকে ১০,০০০/-	৪,০০০/-
ঐ	২ ঘনমিটার	১৬,০০০/- থেকে ২০,০০০/-	৮,০০০/-

সাবসিডি এবং স্কিম সময়ে সময়ে বদলে যায়।সঠিক এবং সাম্প্রতিকতম তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট দেখুন : www.mnre.gov.in এবং www.wbreda.org
ভর্তুকীর অনুমোদন পাওয়ার আগেই সিস্টেম বসিয়ে/কিনে নিলে; ভর্তুকী পাওয়া যাবে না।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিভিত্তিক বিভিন্ন সিস্টেম,তাদের দাম ও ভর্তুকীর পরিমান

সিস্টেম	কার্যকারিতা	দাম(টাকা)	ভর্তুকীর পরিমান (টাকা)
সৌরলণ্ঠন	প্রতিদিন ৪/৫ ঘণ্টা আলো পাওয়া যায়	২১৭৬/-	৫০০/-
সৌর হোম লাইটিং সিস্টেম	প্রতিদিন ৪/৫ ঘণ্টা আলো, পাখা, টিভি চালানো যায়।	২৭০/-প্রতি ওয়াটপিক	সিস্টেমের দামের ৩০ শতাংশ
সৌর পথ আলোক ব্যবস্থা	প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত আলো পাওয়া যায়।	২০,০০০/-	৯৬০০/-
সৌর গরম জল ব্যবস্থা	প্রতিদিন ১০০ লিটার গরম জল পাওয়া যায়।	২৩,৩৫০/-	৫০০০/-
সোলার কুকার	৬-১০ জনের জন্য যেকোন রান্না ৬০/৯০ মিনিটে করা যায়।	৬০০০/-	৫০০/-
ব্যাটারী চালিত বাইক	সরকার নানারকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন।		

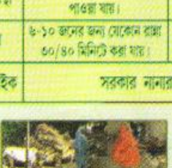

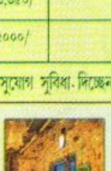

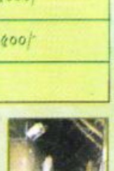

সরকারী অনুদানপ্রাপ্তির নিয়মাবলী, যাবতীয় কারিগরী তথ্যাদি ও বিশদ অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন :
পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা
জে-১/১০, ইপি ও জিপি ব্লক, সেক্টর-৫ সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১, ফোন : ০৩৩-২৩৫৭-৫০৩৮ / ৫৩৪৮ / ৬৫৬৯

KOLKATA-700 122
PH- 99036 63915
78?01 98511

Edited & Published by Shekhar Ahmed from 10J FERN RD. Kolkata-700 019 and Printed from Shanti Mudran, 32/3, Patuatola lane, Kolkata-700 009. Phone : 99036-24992 (Editor)